চতুর্থ অধ্যায়
সামাজিক নারী-পুরুষের সম্পর্ক : নতুন দিকের সন্ধান

''পুরুষের কাছে নারী এক অনন্ত অস্বস্তি; নারী তার চোখে দুই বিপরীত মেরু—আলো ও অন্ধকার; সুখ ও ব্যধি। পুরুষের চোখে নারী দেবী ও দানবী; প্রথমে দানবী, তারপর দেবী। নারী করালী দানবী পুরুষের কাছে, যে তাকে পাপিষ্ঠ ও স্বর্গচ্যুত করেছে; যে তাকে প্রলুব্ধ প্ররোচিত প্রতারিত ক'রে চলেছে। পুরুষ সারাক্ষণ ভয়ে থাকে যে ওই পাপীয়সী তার মতো দেবতাকে নামিয়ে দিতে পারে যে-কোনো রসাতলে। পুরুষ তাকে ভয় করে, তবে এড়িয়ে চলতে পারে না; কাম ও পার্থিব প্রয়োজনে সে নারীর সাথে জড়িয়ে আছে।''[১]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যুগ যুগ ধরে নারীর মূলতঃ দুটি পরিচয়ই প্রাধান্য পেয়েছে। হয় সে পুরুষের 'দাসী' কিংবা পুরুষের চোখে সে 'দেবী'। তবে নারীর দাসী সত্তাটিই মুখ্য হয়ে ধরা দেয়। এদেশে এখনো সনাতন ধর্মে পুরুষ বিয়ে করতে যাবার সময় মা'কে বলে যায় 'মা, তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি'। সংসারে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যদিয়ে যে মেয়েটি ঘরে আসে তার প্রথম পরিচয় হয়ে ওঠে সে দাসী। সংসারের সকলের সেবা করাই তার জীবনের একমাত্র ব্রত। পুরুষের শারীরিক ও মানসিক সব চাহিদা পূরণ করার জন্যেই যেন নারীর জন্ম। সংস্কৃতে 'ভৃত্য' এবং 'ভার্যা' একই ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন অর্থাৎ 'ভৃ'-ধাতু মানে ভরণ পোষণ করা। এই ভরণ পোষণের দায় কাঁধে নিয়ে পুরুষ নারীকে ঘরে আনে দাসীর সেবা পাবার প্রত্যাশায়। আসলে এদেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা সকলেই ছিলেন পুরুষ। তাঁদের ভাবনা প্রসূত আদর্শ জগৎ মানেই পুরুষের জগৎ, তাদের সংস্কৃতি মানেই পুরুষ সংস্কৃতি। নারীর জন্যে পরিসর সেখানে খুবই কম বা নেই বললেই চলে। ফলে সেই প্রাচীনকাল থেকেই নারীকে উর্বর ভূমির সঙ্গে তুলনা করা হত। অর্থাৎ নারীর কাজই হল বংশ রক্ষা করা বা পুরুষসন্তান উৎপাদনের উপায়মাত্র সে। নারীর সমার্থক শব্দ—রমণী, বণিতা, অবলা, বামা ইত্যাদি সবই 'রমণ' বা রতিক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাকে পুরুষের সমকক্ষ ভাবার কোনোই প্রয়োজন নেই—ভরণ পোষণের বিনিময়ে তাকে ভোগ করা আর তার সেবা পাওয়াটাই শেষ কথা। প্রাচীন চিন্তায় নারীকে স্বভাবতই মনে করা হত অশুচি ও অমঙ্গলের উৎস। নারী মানেই বিশ্বাসের অযোগ্য। নারী মানেই নরকের দ্বার ইত্যাদি। নারীকে কখনোই 'পূর্ণ মানব' মনে করা হয়নি। প্রসঙ্গত

কিছু বিশিষ্ট পুরনো ধ্যান-ধারণা তুলে ধরা যায়—

■ বাল্মীকি রামায়ণে লঙ্কা যুদ্ধ জয়ের পর পুষ্পক রথে রামচন্দ্র ফিরছিলেন সীতাকে নিয়ে। সেই বিজয়ের গর্বে রামচন্দ্র সীতাকে কঠোরভাবে অপমান করেছিলেন। তিনি যেন সেই সময়ের পুরুষ প্রতিনিধি, যিনি আপন বীরত্ব আর বংশমর্যাদার রক্ষার জন্যই যেন সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন এবং পরপুরুষ রাবণের আশ্রয়ে থাকা সীতাকে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল 'নোৎসহে পরিভোগায়' অর্থাৎ 'তোমাকে ভোগ করতে আমার আর উৎসাহ নেই'।

■ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মত বহু ক্ষেত্রে আলোকপ্রাপ্ত মানুষটিও মনে করতেন, কিছু কিছু আবশ্যিক গুণাবলী না থাকার জন্যে নারী পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে না।

■ সন্ত টমাস অ্যাকুইনাসও বলেছিলেন, নারী হল অসম্পূর্ণ পুরুষ। নারী তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কখনোই পুরুষের সমান হয়ে উঠতে পারে না।

■ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যদিও নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলেছিলেন তাঁর 'সাম্য' গ্রন্থে—কিন্তু তিনিও তাঁর রক্ষণশীল মানসিকতা থেকে নারীকে পুরুষের মতো পূর্ণ স্বরূপে প্রত্যক্ষ করেননি। তবে তিনি সরাসরি এমন কথা না বলে আদিম সেবী কমলাকান্ত চক্রবর্তীর ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্ট কমলাকান্ত নারীদের সম্পর্কে খুব অকপটে জানিয়েছিল—

''স্ত্রী জাতি অপেক্ষা যে পুরুষ জাতির সৌন্দর্য্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রককলাপ দেখিয়া জলদমুকুট ইন্দ্রধনু হারি মানে সে চন্দ্রককলাপ ময়ূরের আছে, ময়ূরীর নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই। যে ঝুটিতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কুটের যেমন সুন্দর তাম্রচূড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুক্কুটীর তেমন নাই।''[২]

■ ''রূপ, রূপ, করিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সকলেই ভাবে, রূপই কামিনীগণের মহামূল্য ধন, রূপই কামিনীকুলের সর্বস্ব। সুতরাং মহিলাগণ যাহা কিছু কাম্যবস্তুর প্রার্থনা করেন, লোকে কেবল রূপের বিনিময়েই দিতে চায়। ইহাতেই মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনা বর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকের দাসিত্ব।''[৩]

এইভাবে শুধু রূপের সমালোচনাই নয়, মেয়েরা যে 'কুড়িতেই বুড়ি' হয় অর্থাৎ তাদের যৌবন ক্ষণস্থায়ী এবং তাদের বুদ্ধিও কখনও আধখানা 'বৈ পুরা' কমলাকান্ত অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র

দেখতে পান নি। এই রূপের মোহেই 'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীতে ধাবিত, কিংবা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র গোবিন্দলাল রোহিণীতে আসক্ত হয়ে সংসারে অনিবার্য অশান্তি ঘনিয়ে তুলেছিল। এবং এর জন্য বিষময় ফল ভোগ করতে হয়েছিল। সুতরাং বঙ্কিমী ভাবনায় নারী মূলতঃ দাসীর স্তরেই ছিল, 'প্রকৃত নারী' হয়ে উঠতে পারেনি। আর হলেও তার মধ্যে দেবীত্ব আরোপিত হয়েছে। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে তাই দেখি ভাগ্বতগীতার অনুশীলন তত্ত্বের আলোকে সাধারণ নারী প্রফুল্ল দেবীরাণী হয়ে উঠেছিল যদিও শেষ পর্যন্ত তাকে লেখক ব্রজ বল্লভের গৃহে স্থাপন করে বাসন মাজিয়েছেন অর্থাৎ মহীয়সী দাসীতে রূপান্তরিত করেছেন।

বাংলা উপন্যাসে নারী-মুক্তির কথা প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসের বিনোদিনীকে প্রথম যথার্থ নারী বলা যায়, যে অনায়াসেই পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। নারীদের ব্যক্তিসত্তার দুটি রূপের কথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেছিলেন। একটি প্রিয়া এবং অন্যটি জননী সত্তা। এবিষয়ে তিনি তাঁর 'দুই বোন' উপন্যাসের একেবারে প্রথমেই 'শর্মিলা' অংশে জানিয়েছেন—

''মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।
এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।

ঋতুর সঙ্গে যদি তুলনা করা যায়, মা হলেন বর্ষা ঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ। ... আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।''[৪]

লেখকের প্রথমদিকের 'দেনাপাওনা' কিংবা 'হৈমন্তী' অথবা 'করুণা'র মতো রচনায় যেখানে নারীত্বের প্রতি চরম অবমাননা করা হয়েছে, নারীকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অর্থের চেয়ে কম মূল্যবান ভেবেছে সেই সময়ই নারীর কিংবা নারীর জন্যে পুরুষের প্রতিবাদ ধীরে ধীরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাইতো 'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমার স্বামী 'কেনাবেচা দরদামের কথা মানতে চায়নি, বিয়ে করতে এসে বিয়ে করে যেতে চেয়েছে'। কিংবা নিরুপমার মনে হয়েছিল সে কেবল একটা টাকার থলিমাত্র নয়। হৈমন্তীর স্বামী শেষ পর্যন্ত বুঝেছিল হৈমন্তী তার জীবনে সম্পত্তি নয়, ছিল সম্পদ। অন্যদিকে শিক্ষা সংস্কৃতি বর্জিত পুরুষ, 'যোগাযোগ'

উপন্যাসের মধুসূদন কুমুদিনীকে মর্যাদা দেয়নি মূলতঃ অর্থের অহংকারে। শিক্ষা-দীক্ষাহীন স্বামীর লাম্পট্যে করুণা আত্মহননের পথ বেছে নিলেও দাদার শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিতা কুমুদিনী নিজেকে স্বামীর সংসার থেকে দূরে সরিয়ে নেবার কথা ভেবেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার গর্ভের সন্তান তাদের ভাঙা সম্পর্কের মাঝে সেতু স্বরূপ হয়ে উঠেছে। সন্তান না থাকার জন্যে নগেন্দ্র-সূর্যমুখী কিংবা গোবিন্দলাল-ভ্রমরের দাম্পত্য জীবন যেভাবে বিষিয়ে উঠেছিল, কুমুদিনী কিন্তু সেইস্তরে পৌঁছতে পারেনি তার সন্তানের কথা ভেবে। ফলে সম্পর্কটি ভাঙতে ভাঙতে জোড়া লেগে গেছে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে নারী যখনি হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে তখন শুধু তারা নয়, সাধারণ গৌণ চরিত্রেরাও প্রতিবাদ করেছে। যোগাযোগের নবীন এমন একটি চরিত্র যে অনায়াসেই নারীর অবমাননার প্রতিবাদ করে বলেছে—''দেখো মেজো বউ, এ সংসারে অনেক লাঞ্ছনা পেয়েছি, এ বাড়ির অন্নজলে অনেকবার আমার অরুচি হয়েছে। কিন্তু এইবার অসহ্য হচ্ছে যে, এমন বউ ঘরে পেয়েও কী করে তাকে নিতে হয়, রাখতে হয় তা দাদা বুঝলে না,—সমস্ত নষ্ট করে দিলে। ভালো জিনিসের ভাঙা টুকরো দিয়েই অলক্ষ্মী বাসা বাঁধে।''[৫]

ব্যক্তি নারীর প্রতি এই সম্মাননা বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে 'গোরা' উপন্যাসে আনন্দময়ীর জননী সত্তার বিশ্বব্যাপ্তিতে। এই উপন্যাসের সুচরিতার কথাতেও ভারতীয় সমাজে মেয়েদের সঠিক অবস্থানের চিত্র ফুটে উঠেছে। এ দেশের পুরুষ মানুষ মনে করে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে মেয়েদের বাঁধতে বাড়তে আর ঘর নিকোতে দিলেই তাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেল। একদিকে এমন করে তাদের খাটো করে দেখা হবে, তারপর যখন তারা অজ্ঞানতাবশতঃ ভূতের ওঝা ডাকে তখনো তাদের ওপর পুরুষ রাগ করতে ছাড়বে না। যাদের পক্ষে দু'একটি পরিবারের মধ্যেই সমস্ত বিশ্বজগৎ তারা কখনোই সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারে না এবং তারা মানুষ না হলেই পুরুষের সমস্ত বড়ো কাজকে বিনষ্ট করে অসম্পূর্ণ করে পুরুষকে তারা নিচের দিকে ভারাক্রান্ত করে নিজেদের দুর্গতির শোধ তুলতে পারে। এবিষয়ে তাই রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ১০৮ সংখ্যক কবিতায় লিখেছিলেন—

''তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে

ধূলায় সে যায় বয়ে
সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান।”[৬]

নারীর অধিকারের প্রশ্নে তিনিই বিধাতাকে সম্বোধন করে প্রশ্ন রেখেছিলেন, কেন নারীকে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার দেওয়া হবে না? এই প্রশ্নেরই উত্তর সন্ধানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ‘স্ত্রীরপত্র’ গল্পের মৃণাল সংসার ছেড়েছিলেন। এবং পুরুষের পদ দলিত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নারী তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সে আর কিঙ্কিণী বাজিয়ে বাসর ঘরে যাবে না, যতক্ষণ সে প্রকৃত অর্থেই নারী হিসেবে মর্যাদা না পাচ্ছে। এইভাবে জগদীশবাবুর পূর্বসূরী রবীন্দ্রনাথ নারীকে পুরুষের ‘দাসী’ বা ‘দেবী’ হিসেবে নয়, পুরুষের সমকক্ষ স্থানে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পর শরৎচন্দ্রেও নারীর প্রতি অবহেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে। জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী যে অলকাকে একদিন ত্যাগ করেছিলেন পরে দেবদাসী সেই ষোড়শীর গুরুত্ব বুঝতে পেয়ে নিজেই বদলে গেছেন। জগতের মাঝে বিচিত্র রূপিনী নারীরা এইভাবে পুরুষের পদতলে শেষ পর্যন্ত ‘দাসী’ হয়ে থাকেনি। এই নারীরা কখনো রমণী বা প্রেয়সী হিসেবে, কখনো জননী হিসেবে তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছে। নারী চরিত্রগুলিকে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। ফলে সেগুলি একদিক থেকে ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। সমাজের প্রথা ও আচারের যূপকাষ্ঠে যেখানে ব্যক্তি অসহায় হয়েও আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে সেখানেই শরৎচন্দ্রের সমর্থন দেখা গেছে। তিনি দরদী মন দিয়ে পুরুষের জীবনে নারীর মূল্য নির্ণয় করেছেন। কারণ তিনি জানতেন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ কখনোই টিঁকে থাকতে পারে না। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ঘরে ও বাইরে তাদের নারীদের ওপর খড়্গহস্ত হলেই শরৎচন্দ্রের দরদী প্রতিবাদ লক্ষ্য করা গেছে। তিনি নারীর মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে ‘নারীর মূল্য’ প্রবন্ধের সূচনাতেই লিখেছিলেন—‘‘মণি-মানিক্য মহামূল্য বস্তু, কেননা, তাহা দুষ্প্রাপ্য। এই হিসাবে নারীর মূল্য বেশী নয়, কারণ, সংসারে ইনি দুষ্প্রাপ্য নহেন। জল জিনিসটা নিত্য প্রয়োজনীয়, অথচ ইহার দাম নাই। কিন্তু যদি কখনো ঐটির একান্ত অভাব হয়, তখন রাজাধিরাজও বোধ করি এক ফোঁটার জন্য মুকুটের শ্রেষ্ঠ রত্নটি খুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন না। তেমনি—ঈশ্বর না করুণ, যদি কোনদিন সংসারে নারী

বিরল হইয়া উঠেন, সেই দিনই ইঁহার যথার্থ মূল্য কত, সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে আজ নহে। আজ ইনি সুলভ।"[৭]

এইভাবে 'জলের' সঙ্গে উপমায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর মূল্য নিরূপিত হয়ে গেছে শরৎচন্দ্রের চিন্তা-চেতনায়। তিনি স্পষ্টতই উপলব্ধি করেছিলেন, সমাজে পুরুষের পাশ থেকে নারীর স্থান নেমে এসে নরনারী উভয়েই অনিষ্ট ঘটে। কারণ সমাজ মানে নর-নারী শুধু নরও নয়, শুধু নারীও নয়। 'সুসভ্য মানুষের সুস্থ সংযত শুভবুদ্ধি যে অধিকার রমণীজাতিকে সমর্পণ করিতে বলে, তাহাই মানবের সামাজিক নীতি এবং তাহাতেই সমাজের কল্যাণ হয়'[৮] এহেন শরৎসাহিত্যে পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কের নিরীখে নারীর বিচিত্র রূপ প্রতিফলিত হয়েছে—

■ বিবাহিতা, স্বামী বর্তমান অথচ অসামাজিক প্রেম চেতনায় অতৃপ্ত, জীবন বেদনায় কাতরা নারী। এই শ্রেণীর নারীদের মধ্যে 'গৃহদাহ' (১৯২০) উপন্যাসের অচলা অন্যতমা। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬)-র বিমলা শেষপর্যন্ত স্বামী না স্বামীর বন্ধু—নিখিলেশ ও সন্দীপের মধ্যে শ্রেয় ও প্রেমের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে সন্দীপ সম্পর্কে তার মোহ দূর হয়েছে এবং সে স্বামীর কাছেই ফিরে এসেছে। কিন্তু অচলা স্বামী মহিম আর স্বামীর বন্ধু সুরেশ—এই দুই পুরুষের মাঝে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দোদুল্যমান থেকেছে। গৃহ দাহের পর স্বামীর সামনে স্বামীর বাড়ীর ভিটেতে দাঁড়িয়েই অবলা ঘোষণা করেছিল, যাকে সে ভালোবাসে না, তার ঘর করার জন্য সে এখানে পড়ে থাকবে না। সুরেশ যেন তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। আবার সুরেশের সঙ্গে কদর্য জীবনে ডুবে থেকে সে স্বামী মহিমের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিল। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরী হয়ে গেছে। ফলে বিমলার মত অচলার আর প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়নি।

■ বাল বিধবাদের সঙ্গে জীবন জিজ্ঞাসা ও প্রেম চেতনার সঙ্গে আজন্ম সংস্কারের দ্বন্দ্বমথিত হৃদয় বেদনায় জর্জরিতা নারী। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের রাজলক্ষ্মী, 'পল্লী সমাজ'-এর রমা আর 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের সাবিত্রী ও কিরণময়ী এই পর্বের নারী। বাল্যকালে দেবদাস ও পার্বতীর মত একই পাঠশালায় পড়ার কালেই রমা-রমেশ ও শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রতাপ ও শৈবলিনীর মতো 'বাল্য প্রণয়ের অভিশাপের' কারণে তাদের জীবন শেষপর্যন্ত অভিশপ্ত হয়েই থেকেছিল। এরা সকলেই ব্যর্থ প্রেমের গরল কণ্ঠস্থ করে হয়ে উঠেছিল নীলকণ্ঠ—শুধু রমেশ, দেবদাস কিংবা শ্রীকান্তই না, রমা, পার্বতী এবং

রাজলক্ষ্মীও। বিশেষ করে রমা ও রমেশের জীবনে যেখানে বাধাস্বরূপ ছিল পল্লীসমাজ, সেখানে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর জীবনে অবাধ প্রেম আর সম্পর্কের গ্রন্থি বন্ধনে অন্তরায় ছিল রাজলক্ষ্মীরই অন্তরস্থ জীবন সংস্কার—একদিকে সে বিধবা এবং অন্যদিকে মৃতা সতীনের পুত্র বঙ্কুকে ঘিরে মাতৃত্ববোধ। বিশেষ করে এই মাতৃত্ববোধের প্রাবল্য তাকে শ্রীকান্তের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। বড় প্রেম শুধু কাছে টানে না, তা অনেক সময় প্রিয়জনকে দূরেও ঠেলে দেয়—এই তত্ত্বেই শেষ হয়েছে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত, রমা-রমেশ আর সতীশ-সাবিত্রীর সম্পর্কের পরিণতির যাবতীয় সম্ভাবনা। এইসব নরনারী ছাড়া কিরণময়ী চরিত্রটি আলাদা মর্যাদার দাবী রাখে। এই কিরণময়ী রোহিনীর মত শুধু দ্বি-চারিণী ছিল তাই নয়, ছিল বহুচারিণী এবং দেহ সম্ভোগে জ্বালাময়ী। এদিক থেকে সে যেন 'শেষপ্রশ্নের' কমলের পূর্বসূরী। দেহপিপাসা তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করেছে এবং পরিণামে সে হীরাদাসীর মত উন্মাদিণীতে পরিণত হয়েছে। সরোজিনী-সুরবালার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে এই নারী জীবন থেকে তার প্রত্যাশিত কিছুই পায়নি। চরিত্রটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন—"...বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির মধ্যে যে গভীর অনৈক্য তাহাই মানব জীবনের একটা অমীমাংসিত রহস্য; এবং এই জ্ঞানের আলোকে আমরা কিরণময়ী চরিত্রের অসংগতিগুলিকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। কেবল সর্বশেষে তাহার মস্তিষ্ক-বিকারের চিত্রটি অতি আকস্মিক হইয়াছে—উপেন্দ্রর আসন্ন মৃত্যুর সংবাদে যে মূর্ছা তাহার প্রেমের গোপন কথাটি সুবিদিত করিয়া ছিল, তাহার ঘোর যে তাহার বুদ্ধিকে চিরকালের জন্য আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিবে তাহার ইঙ্গিত সেরূপ সুস্পষ্ট হয় নাই।"[৯]

■ ভীরু প্রণয়ে অসর্থক নারী হিসেবে 'পথের দাবী'র ভারতী ও সুমিত্রা ক্ষণপ্রভার মতো আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করে। আসলে সমাজ ও জাতীয় জীবন সমস্যার বিপরীত মেরুতে ব্যক্তি জীবনের চাওয়া-পাওয়া শেষ পর্যন্ত গৌণ হয়ে গেছে এইসব নারীর পরিণতির মধ্যে। সেদিক থেকে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট সবচেয়ে বিতর্কিত নারী হিসেবে 'শেষপ্রশ্নে'র কমল অনেক বেশী অভিনিবেশ দাবী করে। কমল তার ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া নিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চোখে একটা মূর্তিমান তালভঙ্গের মতো। একজন ইংরেজ সাহেবের ঔরসে বাঙালী জননীর গর্ভে যে মেয়েটির জন্ম, তার প্রথম যৌবনের বিবাহের পর বিধবা কমলের বিবাহ শিবনাথের সঙ্গে। কিন্তু তাতেও অতৃপ্তি জনিত কারণে কমল অজিতের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ

হয়ে একটা মুক্তপক্ষ জীবন যাপন করতে চেয়েছে—যে যাপন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কোনকালেই মান্যতা দেয়নি। শরৎচন্দ্র তাঁর ভবঘুরে জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের প্রায় ঘরে ঘরে পৌঁছে যে ভাণ্ডারটি সঞ্চয় করেছিলেন তার পনের আনাই ছিল নারী-পুরুষের জীবন সমস্যা কেন্দ্রীক। কেবলমাত্র প্রেয়সী নারী চরিত্রের ক্ষেত্রেই নয়, জননী চরিত্র সৃজন করেও তিনি সমাজের ত্রিভূজে নারীকে ভূমিরূপে স্থাপন করেছেন এবং তাকে পুরুষের পাশে সম্মানের আসন দিয়েছিলেন। যে সম্মানের কথা কাজী নজরুল ইসলামও তুলে ধরেছিলেন তাঁর কবিতায়—

''সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!
বিশ্বে যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চিরকল্যাণ-কর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।''[১০]

নজরুল এইভাবে শুধু সৃষ্টির অর্ধেক কৃতিত্ব নারীর বলে দাবী করেননি, সমাজ যেসব নারীকে 'বারাঙ্গনা' বলে ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রাখে তাদের প্রতিও তাঁর দরদ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তিনি সমাজের ধর্মাচারী পুরুষকে উদ্দেশ্য করে স্পষ্টতই ঘোষণা করেছিলেন—

''শুন ধর্মের চাঁই—
জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই!
অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়!''[১১]

এইভাবে পুরুষ প্রধান সমাজে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার যে লড়াই শুরু হয়েছিল রাজা রামমোহন রায-বিদ্যাসাগর-স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শায়িত পথে, সাহিত্যে সে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন—মাইকেল মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে কাজী নজরুল এবং পরবর্তীকালে অনেকেই; সেই ধারায় নারীকে নিয়ে পুরুষের যে চাওয়া-পাওয়া, যে সম্পর্কের দোদুল্যমানতা তার মূল্যায়ন করেছেন জীবনানন্দ দাশ তাঁর বোধের নিরীখে—

''ভালো বেসে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে,
ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে;

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা ক'রে চ'লে গেছে—যখন ডেকেছি বারে বারে
ভালোবেসে তারে;
তবুও সাধনা ছিলো একদিন—এই ভালোবাসা।"[১২]

নারী-পুরুষের এই ভালোবাসা ঘৃণা—পারস্পরিক টানা-পোড়েনের থেকে কবি সিদ্ধান্ত করেছেন—'তবু এই ভালোবাসা—ধুলো আর কাদা—' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২)

নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানদণ্ড কী হবে? শরীর না মন? এমন প্রশ্ন জীবনে ও সাহিত্যে বারবার উঠেছে। কুসুমের শরীর সর্বস্বতায় বিরক্ত শশীভূষণ বলেছিল ''শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?"[১৩] এর বিপরীতে শরীরী আবেদন প্রকাশ করে কুসুম খুব অকপটে শশীকে বলেছিল—''এমনই চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটোবাবু।"[১৪]

কিংবা, ''আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটোবাবু?"[১৫]

ভাবনার প্রকাশের নিরীখে তাহলে কে সঠিক—কুসুম নাকি শশী? এই সম্পর্কের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন শরীরটাই আসল, বাকী সব গৌণ। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভা আবার বলেছেন, তাকে ভালো বাসলেও, তার প্রেমে 'বলি' হলেও তাকে শরীরী সীমায় না চেয়ে তার আত্মাকে ভালোবেসো। অনেকে আবার দেহ ও আত্মার যৌথ অস্তিত্বকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাদের ভাবনায় দেহ আধার আর আত্মা হল আধেয়। অর্থাৎ একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব অসম্ভব। সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড বিবাহ জীবনে নারীর মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন—''... নারীকে প্রেমপ্রবণ করার পূর্বে তাহাকে বিশ্বাসপ্রবণ করিতে হয়, আচার-ইঙ্গিত বাক্যে তাহার স্তুতি বা ব্যাজস্তুতি করিতে হয়, ছোটবড় কোন ত্যাগ দিয়া তাহাকে জয় করিতে হয়। তারপর একবার জয় করিলেই নারীকে জয় করা সম্পূর্ণ হয় না। নিত্যকার সম্মিলনে তাহাকে নূতন করিয়া জয় করিতে হয়। এক সালঙ্কারা কন্যাকে তাহার পিতার নিকট হতে বিবাহানুষ্ঠানের মধ্যদিয়া পাওয়া গেল বলিয়া তাহাকে সর্বতোভাবে জয় করা হইল মনে করা মূর্খতা।"[১৬]

ফ্রয়েড আরও মনে করেন, বিবাহ জীবনে সকল নারীই স্বামীকে পুরোপুরি দেহ দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু কেউ কেউ মনের এক আনাও দেয় না। বিবাহ এদের, প্রেমের কবরক্ষেত্র রচনা করে; আজীবন তারা সেই কবরের উপর ফুল ছড়ায়। আর অধিকাংশ পুরুষের স্বভাব কিন্তু উল্টো। শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ধার না ধেরেও মুহূর্ত মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে তারা একটি স্ত্রীলোককে উপস্থিত ভাবে কামনা করে সুযোগ সুবিধা পেলেই তাকে সর্ব-ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করতে উৎসুক ও অগ্রসর হয়। দেহের দিক দিয়ে ভালো লাগলে তাকে দিন কয়েকের জন্য, মাস কয়েকের জন্যে, বছর কয়েকের জন্য ভালোবাসতে পারে আবার না-ও পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবশ্য ব্যতিক্রম রয়েছে। নারী-পুরুষের অন্তর্গত এই দ্বৈত সত্তার কারণ মানুষ নিজেও অনেক সময় খুঁজে পায় না। তবু ধুলো ও কাদার মতো নারী-পুরুষের প্রেমের ধারা প্রবহমান। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উত্তরসূরী হিসেবে জগদীশ গুপ্ত তাঁর উপন্যাসের নারী-পুরুষের সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই ফ্রয়েডের কাছে ঋণী। আসলে জগদীশবাবু তাঁর চারপাশের মানুষগুলির কদর্যজীবন তুলে আনতে গিয়ে নারী পুরুষের সম্পর্কের এই অসুস্থ দিকটির ওপরে আলোকপাত করেছেন। সমাজের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ দাম্পত্য সম্পর্কগুলোর ভেতরের পলেস্তারা ঘসে পড়েছে। অন্যদিকে সমাজ যাদের পতিতা বলে ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রাখে, সেইসব নারীর ভেতরেও পুরুষের জন্য বিশুদ্ধ প্রেমধারা বহমান। কিন্তু বাইরে থেকে সেই ফল্গুস্রোতের প্রকাশ একেবারেই থাকে না। ফলে জগদীশবাবুর সৃষ্ট পুরুষ ও নারী চরিত্রগুলোর সম্পর্ককে প্রচলিত ছকে বাঁধা যায় না। অন্ততঃ পূর্বসূরীদের সঙ্গে এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

লেখকের 'লঘুগুরু' (১৯৩১) গণিকা নারীর সঙ্গে পুরুষের এক অদ্ভুত সম্পর্কের কাহিনী। এই উপন্যাসে গণিকা উত্তম একদিন অন্তরের গৃহ-বুভুক্ষা নিয়ে কদর্য জীবন ছেড়ে বিশ্বম্ভরের হাত ধরে সংসারে স্থিত হতে চেয়েছে। সংসারে এসে তারই হাতে তারই শিক্ষা-দীক্ষায় লালিতা মাতৃহারা টুকীর বিয়ে হয়েছে পঞ্চাশোর্ধ পরিতোষের সঙ্গে। এই পরিতোষ আবার রক্ষিতা সুন্দরীর সঙ্গে কদর্য জীবনে লিপ্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত টুকীকে পাপের পথে নেমে যেতে হয় পরিতোষ আর সুন্দরীর ষড়যন্ত্রে। ফলে গণিকা উত্তমের সংসারে ফেরা থেকে টুকীর মধ্যদিয়ে পুনরায় কদর্য জীবনে অবতরণের মধ্যে পুরুষের ভূমিকায় সম্পূর্ণ হয়েছে একটা জীবন বৃত্ত। এই কাহিনীর মধ্যে নারী পুরুষের সম্পর্কের তিনটি কোণ রয়েছে—

- উত্তম-বিশ্বম্ভর
- পরিতোষ-সুন্দরী এবং
- টুকী-পরিতোষ।

লেখকের গণিকা নারীর সঙ্গে অনেকটা মাতৃসুলভ সম্পর্ক, গণিকাদের তাঁদের বাড়ীতে যাতায়াত সূত্রে গণিকাদের সঙ্গে তার একটি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আত্মকেন্দ্রিক লাজুক প্রকৃতির এই মানুষটি চিরকাল ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ। নিজের সম্পর্কে তিনি প্রায় কিছুই বলতে চান নি। তাঁর স্ত্রী চারুবালা দেবীর কাছ থেকে লেখকের এই পতিতা সংস্পর্শের কথা জানা যায়। কুষ্ঠিয়ার বাড়ীতে পতিতা নারীরা প্রায়ই আসত লেখকের মায়ের কাছে। এবং বালক জগদীশকে নিয়ে অনেক সময় পর্যন্ত ওদের কাছে রাখত। চারুবালা দেবী জানিয়েছেন—''শ্বশ্রূমাতার কাছে শুনিয়াছি আমলাপাড়ায় আমাদের বাড়ীর ডান পাশ দিয়া অনেকঘর পতিতার বাস ছিল। উহারা লোকের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করিত, আঁতুড় পাহারা দিত, কেহ কেহ ঘর ভাড়া করিয়াও থাকিত। ইনি (জগদীশ গুপ্ত) হইবার পর পাঁচ-ছয় মাসের পর ওরা নিজেদের কাছে রাখত, একটু বড় হইলে মালাচন্দন দিয়া সাজিয়ে বাঁশি হাতে দিয়া আনন্দ করিত। শ্বশ্রূমাতা নিজের বাড়ীর জানালা দিয়া দেখিয়াছেন; সময় মতো দিয়া যাইত।''[১৭]

লেখক পত্নীর এই কথা থেকে বোঝা যায় নিকটস্থ পতিতা পল্লীর কোনো কোনো নারীর সঙ্গে জগদীশবাবুর মায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। গৃহী নারী আর পতিতা নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য বালক জগদীশ দেখেননি সেদিন। স্বভাবতই পতিতা নারীর সঙ্গে তাঁর ঘৃণার কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি, বরং একটা মধুর সম্পর্কই স্থাপিত হয়েছিল। বালকটির সঙ্গে এইসব পতিতা নারীর সম্পর্ক ছিল একেবারে মাতৃস্থানীয়। সেই সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে ঐসব পতিতা নারীর ওপর বালক জগদীশ তাঁর দুষ্টু বুদ্ধি আর দুরন্তপনা প্রয়োগ করতেন। একবার অল্প বয়সে জগদীশবাবু ড্রেনের মধ্যে পরে গেলে ওরাই তাঁকে ড্রেন থেকে তুলে বাঁচিয়েছিল। এই নিবিড় সম্পর্ক ছাড়াও উত্তরকালে আদালতের টাইপিস্টের কর্মসূত্রে তিনি বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন। স্বভাবতই নরনারীর সম্পর্কের নানা কৌণিকতা তাঁর চোখে পড়েছিল। কখনো কখনো নতুন বৌ-স্ত্রীকে নিয়ে তিনি পথে বের হয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে কথোপকথন এমনকি ঝগড়াঝাটি হত, তিনি অদূরে দাঁড়িয়ে থেকে সেসবও দেখেছেন। এই বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর উপন্যাসের নারী-পুরুষের সম্পর্কের নানা জটিলতর

দিক।

উপন্যাসে উত্তমের গণিকা সত্তাটির পরিচয় দিতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন—"... মানুষকে হাতে পাইয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া খেলাইয়া খেলাইয়া পিশাচ করিয়া তুলিবার বিদ্যাটা সে চেষ্টা করিয়া ভিতরকার বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শিক্ষা করিয়াছিল তখন তার নাম ছিল বনমালা—তারও আগের নাম তার যূথী। মানুষ সেই যূথীর শত্রু।"[১৮]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিজের জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্যে সংসারের নারীকে পতিতা করে তোলে যে কোন মূল্যে। সংসারের যূথী নাম্নী মেয়েটি হয়তো এভাবেই একদিন পাপের পথে নামতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে পতিতা জীবনে এসে যূথীর গৃহী পরিচয় হারিয়ে যায়। তখন সেই নারী অজস্র নামের আড়ালে তার মূল শিকড় হারিয়ে ফেলে। বহু পুরুষকে তৃপ্ত করে তাকে বেঁচে থাকতে হয় ছদ্ম পরিচয়ের আড়ালে। একা। যতদিন শরীরটা পুরুষের ভোগের উপযোগী থাকে ততদিন অর্থ-উপার্জন হয়। তারপর রসশূন্য আখের ছিবড়ের মতো হয়ে যায় সেই নারীর জীবন। তখন বিকল্প জীবিকার সন্ধান করতে হয়। সঞ্চয়ীকৃত অর্থ নিয়ে স্থায়ী ঠিকানার চিন্তা করতে হয়। উত্তম তাদেরই একজন। পতিতা জীবন ছেড়ে বর্তমানে একাই গৃহের অধিবাসী সে। চোখে তার স্বপ্ন স্থায়ীভাবে গৃহী জীবনের একজন হয়ে ওঠা। ভগিণী পতি লালমোহনের বাড়ী যাবার পথে বিশ্বম্ভর খেয়া নৌকায় উত্তমকে দেখে, তার মনে হয় 'এই তার মনের মানুষ', উত্তমও হয়তো এমনই ভেবেছিল। তারপর লালমোহনের মধ্যস্থতায় তাদের কাছাকাছি আসা। এই উত্তম ভোগী পুরুষের ক্ষুধা নিবৃত্তির নারী নয়। বিশ্বম্ভরের কাছ থেকে সে মাতৃহারা টুকীর কথাও শুনেছে। ফলে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে সে তার স্থায়ী ঠিকানা ছেড়ে চলে এসেছে। কিন্তু স্ত্রী হিসেবে 'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' বিশ্বম্ভর কোনোদিন উত্তমকে সম্মান করেনি। উপন্যাসে নানা ঘটনায় সেই অসম্মান, বঞ্চনা, মানসিক নির্যাতনের পরিচয় লেখক তুলে এনেছেন। উত্তমকে সংসারে নিয়ে এসে বিশ্বম্ভরের মনের যে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া তার মধ্যেই পুরুষসত্তার বীভৎসরূপ পরিস্ফুট হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ লেখক জানিয়েছেন—"...স্ত্রীর কাছে সে নিজে লক্ষ্মী ছাড়া আচরণের বড়াই করিত এ-ও স্ত্রীলোক; কিন্তু ইহার সম্মুখে তাহার সেই আচরণের ফল অত্যন্ত বীভৎস বলিয়া বিশ্বম্ভরের এখন মনে হইতে লাগিল।"[১৯]

উত্তমের আগমনে প্রতিবেশীদের কৌতূহলে বিরক্ত বিশ্বম্ভর জানিয়েছে নতুন মানুষের গন্ধ

পেলেই প্রতিবেশীরা দল বেঁধে দেখতে আসবেই। কিন্তু উত্তম তো নতুন বৌ নয়। অর্থাৎ শুরু থেকেই বিশ্বম্ভর উত্তমকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি। কিন্তু উত্তমের আচার-আচরণে সে বুঝতে পারে উত্তমকে সে যে বস্তু মনে করেছিল সে বস্তু নয়। এই নারী বাধ্য করতে জানে। স্ত্রী সে নয়। স্ত্রীর নবতর ও উৎকৃষ্টতর একটা রূপ সে। স্ত্রীকে গণ্ডীর মধ্যে ফেলে পিষতে পারা যায়; নিজের মনটাকে তৈরী করে নিলেই পেষণ অনায়াসসাধ্য। আর স্ত্রীতো গণ্ডীর বাইরে যাবে না। কিন্তু উত্তমের সেই সংকীর্ণতা নেই। সমস্ত পৃথিবী তার জন্য মুক্ত, সে স্বেচ্ছায় ডানা গুটিয়ে 'পিঞ্জরে' ঢুকেছে। অবশ্য এই গভীরবোধ ক্ষণিক। সুযোগ বুঝে বিশ্বম্ভর তার 'পুরুষরূপ' ধরেছে। অত্যন্ত নিস্পৃহ উদাসীনভাবে তারই কৃতকর্মের জন্য সে তার পূর্বপত্নী হিরণের মৃত্যু হয়েছে সেটা উত্তমকে জানালে 'উত্তম সত্যি ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে।' এই কান্না দেখে বিশ্বম্ভর হো হো করে হেসে উঠেছে এবং উত্তমকে অনায়াসেই বিড়াল-শকুনের সঙ্গে তুলনা করে বলেছে—''...কার শোকে কে কাঁদেরে বাবা তার দিশে পাওয়া ভার—মাছ মরলে বিড়াল কাঁদে, গরু মরলে শকুন; আর পদির পিসী কাঁদে পদি মারলে বলে উকুন।''[২০] ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে বাড়ীতে মদের আসর বসাতে চাইলে উত্তমের অনুমতি মেলেনি। বিশ্বম্ভর চেয়েছিল উত্তমও সেই আসরে থাকুক। তখন উত্তম জানতে চেয়েছে টুকীর মা-ও আগে থাকত কিনা। প্রত্যুত্তরে 'দাঁতে জিব কাটিয়া বিশ্বম্ভর বলিল,—না, না; সে ছিল বউ মানুষ'। এখানেও বিশ্বম্ভর উত্তমের নারীসত্তায় আঘাত করেছে। বন্ধুরা অনুমতি না পেয়ে উত্তমকে 'খাণ্ডারী' বললে বিশ্বম্ভর তার প্রতিবাদ করেনি। কেবল সেই সংবাদটি উত্তমের কাছে পরিবেশন করেছে উত্তমের নারী সত্তার কথা না ভেবেই। প্রতিবেশী মোক্ষর মা টুকীর কানে কানে বিষ ঢেলে বলেছিল—'তোর মা বেশ্যে ছিল। গয়না দিয়েছে হাজার লোকে—তোর এ বাবা দেয়নি।'[২১] একথা টুকীর কাছে শুনে বিশ্বম্ভর এর জন্য কোনো প্রতিবাদ না করে মেয়ের আকুলতা নিয়ে লালমোহনের সঙ্গে রসিকতা করে আসলে উত্তমকে অপমান করেছে নির্দ্বিধায়। প্রতিবেশীরা টুকীকে নিয়ে উত্তম পালিয়ে গিয়ে দেহ ব্যবসায় লাগাতে পারে—এমন আশংকাকে মৃদু সমর্থন জানিয়েছে বিশ্বম্ভর। উত্তমের শেখানো পথে টুকী 'কাপড় ছেড়ে রান্নার জল' দিচ্ছে দেখেও বিশ্বম্ভর উত্তমকে কটাক্ষ করতে ছাড়ে নি—''...তোমার শুচিবাই দিন দিন বাড়ছে দেখছি। গেরস্তের ঘরে ওটা কিছু কিছু থাকা ভাল; কিন্তু তুমি অনেক গেরস্তের বৌকেও হা'র মানিয়ে দিতে পার।''[২২] যে উত্তমের অর্থে বিশ্বম্ভর তার সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ ফিরিয়েছে সেই উত্তমের

কারণে যখন টুকীর বিয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছিল বারবার তখনো উত্তমকেই আক্রমণ করেছে অকৃতজ্ঞ বিশ্বম্ভর। একদিকে প্রথমা পত্নীঘাতী বিশ্বম্ভর এইভাবে উত্তমকে সংসারে নিয়ে এসে কোনদিন যথার্থ নারীর সম্মান দেয়নি। যদিও দু-একটি ক্ষেত্রে বিশ্বম্ভর যে উত্তমকে ভালোওবাসতো তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তমের বাড়ীর সম্পত্তি বিক্রির টাকা ও কাগজপত্রাদি দিয়ে ফেরার সময় লালমোহন উত্তমকে বলেছিল যে বিশ্বম্ভর বোকা কিন্তু উত্তমকে ভালোবাসে। এছাড়া বন্ধুরা মদ্যপানের আসর বসবার জন্য বিশ্বম্ভরকে দিয়ে উত্তমের কাছে পাঠিয়েছিল। কিন্তু উত্তম রাজি হয় নি। তখন ব্যর্থ মনোরথ বিশ্বম্ভরের উত্তমের প্রতি ভালোবাসা আর হারাবার ভয়ের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—''...ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিবার সময় তার মনের গতি ফিরিল। তার মনে হইতে লাগিল, আমি তাকে ভালবাসি সেও ভালবাসে এককালে যে দশজনের পক্ষে-সুলভ ছিল বলিয়াই কেবল সেই কারণেই এখনও তাহাকে হাটের মধ্যে নিজেও ডাকিয়া আনিয়া সুলভ প্রাপ্যের দলে ছাড়িয়া দিতে হইবে, ইহাই বা কেমন কথা! তাহাতে কোন লাভ নাই, বরং লোকসানের ভয় আছে—তাহাকে চিরদিনের মতো হারাইবার ভয় আছে।''[২৩] এই ভয় থেকেই সে উত্তমের কাছে 'তেতলার বড়বাবুর'র গল্প শুনে গর্জন করে বড়বাবুকে 'শালা' সম্বোধন করে তাকে পথের মাঝে ধরে জুতো পেটা করতে চেয়েছিল। এইভাবে আত্মস্বার্থ-সর্বস্ব বিশ্বম্ভর স্ত্রীর প্রতি যে আচরণ করেছিল তাতে তাকে খাঁটি শয়তান না বললেও পুরোপুরি ভালো মানুষ বলা যায় না।

উপন্যাসে বিশ্বম্ভরের বিপরীতে স্ত্রী হিসেবে গণিকা উত্তম যেন মূর্তিমান তালভঙ্গ। গৃহ বুভুক্ষা উত্তমকে বিশ্বম্ভরের গৃহে এনেছিল। কিন্তু বিশ্বম্ভরের কথাতেই সে আর পাঁচজন বঙ্গ গৃহী নারীর মতো সংসারের ময়দানে ফুটবল মাত্র ছিল না—যাকে যেভাবে খুশি যেকোন দিকে লাথি মেরে উদ্দেশ্যের অভিমুখী গোলপোষ্টে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। যূথী থেকে বনমালা আর বনমালা থেকে উত্তম সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির নারী। এই উত্তম বিশ্বম্ভরের মতো হীনমন্য স্বার্থপর-মাতাল-লম্পট মানুষকে ভালোবেসেই নিজের স্থায়ী আশ্রয় ছেড়ে চলে এসেছিল। সংসারে এসে মাতৃহীনা টুকীকে বুকে টেনে নিলে তার মধ্যে মাতৃসত্তারও জাগরণ ঘটেছিল। কিন্তু বিশ্বম্ভরের মতো পৌরুষ সম্পন্ন পুরুষদের কাছে সে সহজে মাথা নত করেনি। বিশ্বম্ভর সম্পর্কে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করে সে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে চেয়ে বলেছে টুকীর সামনে ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে কোনমতেই গৃহে আসর বসানো চলবে না। তার মনের অবস্থা

ব্যক্ত করে লেখক জানিয়েছেন—''...শত পুরুষের মুখে সহস্রবার সে এই পৌরুষের কথা শুনিয়াছে; স্ত্রী একেবারে ব্যক্তিত্ব বর্জিত পদানত কৃপাভিক্ষু বলিয়াই তাহাকে তার ভাল লাগে নাই—যেখানে প্রখর স্পষ্ট কথা, উদ্দামতা, কাড়াকাড়ি করিয়া পূর্ব্বোপভুক্ত সামগ্রী ভোগ করিবার দুর্দ্দমনীয় নেশা ঘূর্ণিত হইতে থাকে সেই স্থানটি তাহাদের এমন মধুর লাগে যে, আত্মবিস্মৃতিতে মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত থাকে না—
এই ব্যক্তি তাহাদেরই একজন।''[২৪] ব্যক্তিত্বহীন স্বামী যখন বন্ধুরা স্ত্রীকে 'খাণ্ডারী' বললেও প্রতিবাদ করতে পারেনি তখন উত্তমের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছে এবং স্ত্রীকে বেড়ালের মত বস্তায় পুরে বিদেয় করা কিংবা দুধ মাছ দিয়ে পোষ মানানোর খেলাকে উত্তম ধীক্কার জানিয়েছে। বহু পুরুষচারিণী উত্তম সংসারের বৃত্তে এসে খুব অল্পদিনেই বিশ্বম্ভরকে চিনে নিয়েছে। পুরুষ হিসেবে বিশ্বম্ভরের মোহ জন্মে, কিন্তু অপছন্দ হলে গায়ে হাত তুলতেও তার বাধে না। নৈতিক মর্যাদার বিন্দুমাত্র বোধ নেই। সুখ দুঃখের অনুভূতির ধার সে ধারে না। বিদ্ধ করে ছেড়ে দিলে ঘুরে আসে। 'পনের আনা মেরুদণ্ডহীন মানুষের এই চরিত্র'। কিন্তু শক্তি মানুষের চিরদিন থাকে না বলে উত্তমেরও আস্তে আস্তে সব সহ্য হয়ে যেতে থাকে। বিশ্বম্ভরের সব অপমান সে নীরবে সয়ে যায়। টুকীই হয়ে ওঠে তার ধ্যান-জ্ঞান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারই কারণে টুকীর বিয়ে ভেঙ্গে গেলে সে নিজেকে অপরাধী মনে করে টুকীর কাছে ক্ষমা চায়। তার আপত্তিকে গুরুত্ব না দিয়ে বিশ্বম্ভর পঞ্চাশোর্ধ বিপত্নীক পরিতোষের নরকে টুকীকে নিক্ষেপ করে। উত্তমের ভেতরের নির্মল শুভ্র নারী সত্তা টুকীকে শেষদিন পর্যন্ত সৎ পরামর্শ দেয়—''...স্বামী পরমগুরু সাক্ষাৎ ভগবান; তাঁহাকে কিছুতেই অবহেলা করিবে না, ইহাই আমার একমাত্র কথা। কোনো অবস্থাতেই তাঁহাকে লঘু ভাবিও না; যদি অনুমতি দেন তবে তার চরণ পূজা করিও।''[২৫] এককথায় গণিকা উত্তম যেভাবে গৃহী নারীর অন্তরে নিজেকে নিয়ে গিয়েছিল, বাংলাদেশের বহু গৃহী নারীও সেই স্তরে পৌঁছতে পারে না।

উপন্যাসে উত্তম আর টুকীর মধ্যবর্তী গণিকা সত্তাটি হল সুন্দরী। বাহ্য সুন্দর নামের আড়ালে এই সুন্দরী বারাঙ্গনাটি যেন নিষিদ্ধ পল্লীর সব বেশ্যাদের কর্ত্রী, এক ধরণের মাসি চরিত্র যে গণিকাদের জন্য খদ্দের ঠিক করে কেবল জীবিকা নির্বাহ করে তা নয়, জৈবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির এক পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করে নতুন মেয়েদের জন্য খদ্দেরের আমদানীর মধ্যদিয়ে। চরিত্রটি যেন 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকের পদী ময়রাণী চরিত্রটির উত্তরসূরী।

যদিও উপন্যাসে তার কোনো পূর্ব-পরিচয় লেখক দেননি। চরিত্রটি সম্পর্কে সমালোচক ড. সরকার আবদুল মান্নান যথার্থই লিখেছেন—''উপন্যাসে সুন্দরীর বেড়ে ওঠার কোনো ইতিহাস নেই। বংশানুক্রমিকভাবেই সে কোনো মানসিক বৈকল্য ধারণ করে নিয়ে এসেছে কিনা তাও জানা যায় না। কিন্তু যে সামাজিক পরিমণ্ডলগত বাস্তবতার মধ্যে সে বসবাস করে সেখানে এই মনোদৈহিক বিকৃতিই স্বাভাবিক। এক অপরিমিত যৌন অস্বাভাবিকতার মধ্যেই সে বেঁচে আছে।''[২৬] উপন্যাসে সুন্দরীকে আমরা দেখি পরিতোষের রক্ষিতা হিসেবে। বিপত্নীক পরিতোষের সঙ্গে তার দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সম্পর্ক। চাকরী করার সময় পরিতোষের আয় ছিল ঢের, ফলে বাজে খরচ করেও কোনো আর্থিক সংকট দেখা দেয়নি। কিন্তু অবসরের পর নামকীর্তনে ডুবে থাকার কারণে সংসারে স্বভাবতই অনটন শুরু হয়। সুন্দরী আক্ষেপ করে বলেছে—''... তোমায় নিয়ে আমার চিরকালই দুঃখে গেল। দুঃখে ভাজা হয়ে গেছি।''[২৭] চাকরী সূত্রে পরিতোষ যখন উদ্ধবপুরে প্রথম বদলি হয়, সেই সময়ই সুন্দরীর সঙ্গে তার পরিচয়। তখন থেকেই তারা ডোমপাড়ায় একইসঙ্গে বসবাস করছে। এই বাড়ীঘর সুন্দরীর। তবে তিনখানা ঘরের একখানাকেই ঘর বলা চলে—বাকীগুলোর বিপর্যস্ত অবস্থা। আর একখানা ঘর নয়, বেড়ার সঙ্গে আধলা বাঁশ সারবন্দি করে টিনের আচ্ছাদন দেওয়া আছে সেখানায় রান্না হয়। এরকম বস্তির মতো অসুস্থ পরিবেশে দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে তাদের অশ্লীল কদর্য জীবন যাপন। তবু পরিতোষ নামক পুরুষটি এতকাল ছিল তার একার। কিন্তু বঙ্কুর আনিত বিয়ের প্রস্তাবে সুন্দরীর অভিমানে আর ক্ষোভে শরীর জ্বলে যায়। পরিতোষের কথায় উত্তরে সে স্পষ্টতই জানিয়ে দেয়—''...আমার ওজর নেই, করো তুমি বিয়ে। আর পারিনে দিনরাত নেই নেই করতে—ইঁদুরে খুঁটে খাবে এমন দানাটিও নেই ঘরে। আমার মায়ের মা মরেছে পালঙ্কে শুয়ে, মা মরেছে পালঙ্কে শুয়ে; আমি ডোমপাড়ার ঘাটে মরব না—তুমি বিয়ে করো।''[২৮] সুন্দরী ভালোভাবেই জানত পঞ্চাশোর্ধ পরিতোষ টুকীকে বিয়ে করছে শুধুমাত্র অর্থের জন্য এবং যুবতী বউটিকে পেলে ভবিষ্যতে স্থায়ীভাবে সঞ্চয়ের একটি সুনিশ্চিত পথ তৈরী করবার জন্য। এই অসুস্থ ভাবনায় সুন্দরীরও সায় ছিল। কারণ তার কাছে পাপ-পুণ্য বলে কোন কিছু ছিল না, তার মনে হত শরীরের সুখই আসল সুখ। মনের সুখও শরীরের সুখ দিয়েই আসে। তাই টুকীর বিয়ের নগদ পণ বাবদ আঠারো শ' টাকা সে পরিতোষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু সেদিন রাত্রেই ঐ টাকা চুরি হয়ে গেলে সুন্দরী দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং

এরপর তার নজর পড়ে টুকীর উদ্ভিন্ন যৌবনের উপর। আপাদমস্তক পাপের পক্ষাঘাতগ্রস্ত সুন্দরীর মধ্যেও একটা শুভ চেতনা সম্পন্ন নারী ছিল যেটা পরিতোষ কোনদিন টের পায়নি। উত্তমের প্রতি সুন্দরীর সম্ভ্রমবোধ কিংবা বিশ্বম্ভরের পরিতোষের গৃহে আগমনের পর সুন্দরী লজ্জায় তার সামনে প্রথমে আসতে পারেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিতোষ আর তার ষড়যন্ত্রে টুকীকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে খদ্দেরের কাছে।

সুন্দরীর সঙ্গে কদর্য জীবন কাটাবার আগে পরিতোষ বিয়ে করেছিল ছত্রিশ বছর আগে 'দুদিনের জন্য'। স্ত্রী অল্পদিনেই মারা যায়। ফলে স্বামী হিসেবে তার কোন সুস্থ সুন্দর পরিচয় প্রথমাবধি আমরা পাই না। এমনকি স্ত্রীর জন্যে তার মধ্যে কোনরকম তাপ-উত্তাপ দেখি না। ঠক প্রবঞ্চক 'কোমর বাঁধা শয়তান' এই চরিত্রটি সুন্দরীর যৌবনটুকু শুধু ভোগ করেছে। কোন নৈতিক কর্তব্য পালন সে করেনি। পরে তাই অনায়াসেই টাকার লোভে টুকীকে বিয়ে করতেও তার মনে কোনো দ্বিধা হয়নি। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই টুকী বুঝে গিয়েছিল তার সুস্থ দাম্পত্য জীবনের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। কারণ সুন্দরীর সম্পর্কে টুকী জানতে চাইলে অনায়াসেই পরিতোষ উত্তমের সঙ্গে তুলনা টেনে জানিয়েছে 'তোমার মা তোমার বাবার যা হয়।'[২৯] শুনে টুকীর মুখ পাংশু হয়ে গেছে। মায়ের মুখটা মনে করে তার চোখ জলে ভরে গেছে। নিজেকে সে সৌভাগ্যবতী ভেবেছে, অমন মায়ের হাতে মানুষ হতে পেরে। এবং পরিতোষ সম্পর্কে তার ধারণা স্পষ্ট হয়ে গেছে। লেখক তার মনোভাব ব্যক্ত করে জানিয়েছেন—''এই ব্যক্তি তাহার পিতার দুর্ব্বলতার সুযোগে তাহার মায়ের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছে। সঙ্গে সে আসিয়াছে আনুসঙ্গিকভাবে। সে পত্নী নয়, দায় মুক্তির দক্ষিণা।''[৩০] ঘুমন্ত স্বামীর রূপহীন দেহটা টুকীর কাছে অসহ্য লাগে। আর পাশের ঘরে সুন্দরীর বীভৎস নাক ডাকাকে মনে হতে থাকে সর্ব্বভূক্ রাক্ষসের সঘন উদ্গারের মত। টুকীর চোখের সামনে দেওয়ালে একটা ছবি ছিল যাতে, কোন এক সতী স্বামীর পাদপূজা করছে ফুল ঢেলে পা আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। পরিতোষ কিংবা বিশ্বম্ভর কেউই অমন স্বামী নয়। তবু উত্তম নিজের গুণে ঢেকে রেখেছিল বিশ্বম্ভরকে। তাই টুকীর কাছে পৃথিবীটা ছিল সুন্দর। মায়ের কথা খুব মনে পড়ে টুকীর এবং তারই শিক্ষায় শিক্ষিতা টুকী পরিতোষের যৌবনকালের একটি ছবিকেই টাঙিয়ে রেখে পূজা করত। কিন্তু পরিতোষ সেই পূজা পাবার যোগ্য ছিল না। সে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে একদিন সেসব টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। টুকীর অন্তরের নারীত্বটুকু সে যেন

এইভাবে গলা টিপে হত্যা করে। এরপরেই টুকীকে পাপের পথে নামানোর যৌথ আয়োজন চলে। এইভাবে 'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' বিশ্বম্ভর, 'কোমরবাঁধা শয়তান' পরিতোষ আর শরীর সর্বস্ব পুরুষ অচিন্ত্যদের মিলিত প্রয়াসে উত্তম-সুন্দরী-টুকীদের জীবন অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। সম্পর্কের এই বীভৎস ও করুণ দিকটিকেই জগদীশবাবু বড় করে দেখিয়েছেন। এখানে তাঁর সৃষ্ট নারী-পুরুষের ভালোবাসার সম্পর্ক 'ধুলো আর কাদা' হয়ে ওঠেনি।

বাংলাদেশের সমাজ যে মেয়েদের কোনোকালেই মানুষ হয়ে উঠতে দেয়নি; মেয়ে করেই রেখেছিল, রাখতে চেয়েছে, পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠতে দেয়নি, তার যথার্থ উদাহরণ লেখকের 'সুতিনী' উপন্যাসটি। সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত উপন্যাসটি সম্পর্কে লিখেছেন—''সুতিনী একটি বহুমাত্রিক জটিল মানসিকতার উপন্যাস। বাঙালির পুরনো দিনের পরিবার জীবনে একটি মৃতবৎসা নারীর মনোকুটের বিভিন্ন স্তর এই লেখায় বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে বিন্যস্ত হয়েছে। বাঙালির সংসার সমাজে নারীর (এবং পুরুষেরও) যৌনতা ভিত্তিক মনোকুটের অর্থাৎ সেক্স-অবসেশনের এই উৎসটি সুপরিচিত। জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে মনোবিকারের যে বিচিত্র চরিত্র-মূর্তি অঙ্কনের চেষ্টা তার মধ্যে সুতিনীর সমস্যাটি বিশেষভাবে বাঙালী জীবনের অঙ্গ।''[৩১]

এই বাঙালী জীবনেরই একটা বড় দিক নারী-পুরুষের সম্পর্ক। বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনের বিচিত্র জটিল সমস্যার নিরীখে। সম্পর্কের সমীকরণ কেমনভাবে বদলে যায় সেসব একেবারে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে এনেছেন জগদীশবাবু। এই উপন্যাসে রাজবালা ও দুর্গাপদর সংসারে একটা সময় পর্যন্ত শান্তি ছিল। কিন্তু রাজবালা পরপর চারটি মৃতপুত্র প্রসব করায় সংসারে অশান্তির কালোমেঘ ঘণীভূত হয়ে ওঠে। রাজাবালা মৃত সন্তান প্রসবের দায় স্বামীর ওপর চাপায়। স্বামীর ভগ্ন স্বাস্থ্য, শ্রীহীনতাজনিত কারণেই যেন চতুর্থ পুত্রের মৃত্যুর পর রাজবালার মূর্তি ভয়ংকর হয়ে ওঠে। একটা সময় স্বামীর প্রতি তাকে বলতে শোনা যায়—''সাত বছর গোঙালে আমায় নিয়ে তুমি—রোজ এমন চমকালে' এতদিন পাঁজরায় হাড় ফেটে প্রাণ বেরিয়ে যেত' তোমার। আমার অদ্দেষ্ট দেখে' তোমার চমকানই উচিত। তোমার বিবেচনা নাই এমন ত' নয়—আমার স্বামী-ভাগ্য আর তোমার সন্তান ভাগ্য দেখে স্বয়ং শনি চম্‌কে যাবেন—তুমি ত' মানুষ; শনির মতো তুমি মানুষের কাচা মাথা সত্যিই চিবিয়ে খাও না; কিন্তু আমার অদৃষ্ট তুমি পুড়িয়ে দিয়েছ।''[৩২] যে মেয়ে ছেলেবেলায় বেড়াল পোষা নিয়ে মায়ের

সঙ্গে ঝগড়া করতে ছাড়ে নি, সেই একগুঁয়ে জেদী মেয়েটি স্বামীর সুস্থ সন্তান দানের অক্ষমতা আর নিজের জরায়ুর সুস্থতা প্রমাণের জন্য সে মরীয়া হয়ে ওঠে। জেদের বশে নিজের বোন মধুবালার সঙ্গে স্বামীর বিয়ে দেয়। মুহূর্তের এই বিভ্রান্তি রাজাবালার জীবনে ট্রাজেডি ঘনিয়ে তোলে। বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই মধুবালা আর স্বামীর সম্পর্ককে ঘিরে রাজবালার জীবনে যে চরম বিপর্যস্ত অবস্থা দেখা দিল তারই পূর্ণরূপ প্রত্যক্ষ করা গেল মধুবালা পুত্রবতী হওয়ায়। অন্তরের সুপ্ত ঈর্ষা এখন আগ্নেয়গিরির মতো প্রবল অগ্ন্যুৎপাত শুরু করে। কেবল ঈর্ষা নয়, নিজের পরাজয়ের গ্লানি ও আত্মধিক্কার তাকে জর্জরিত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত সে তার জরায়ু সংক্রান্ত মিথ্যা জনরবকে মিথ্যা প্রমাণ করার লক্ষ্যে সফল হয়েছে। আসলে দুর্গাপদ'র কাছে স্ত্রী হিসেবে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই ছিল তার কাম্য। কিন্তু সেটা সে পারেনি। কারণ প্রতিষ্ঠার বেদী থেকে সে নিজেই নিজেকে বিসর্জন দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখী যখন নগেন্দ্রর কাছে কুন্দনন্দিনীর কথা শুনেছিল, তখন নিছক মজার ছলে চিঠিতে স্বামীকে লিখেছিল—''একটি বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমায় ভুলিলে? অনেক জিনিষের কাঁচারই আদর। নারিকেলের ডাবই শীতল। এ অধম স্ত্রী জাতিও বুঝি কেবল কাঁচামিটে? নহিলে বালিকাটি পাইয়া আমায় ভুলিবে কেন? ... আর যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল, আমি বরণডালা সাজাইতে বসি।''[৩৩]

এরপর স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে সূর্যমুখীই স্বামীর সঙ্গে কুন্দর বিয়ে দিয়েছে কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'দুইবোন' উপন্যাসে শর্মিলার মনের অবস্থার সঙ্গে রাজবালার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও রাজবালার এই প্রয়াস ছিল সম্পূর্ণই তার স্বেচ্ছাধীন এবং সুপরিকল্পিত। এই ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনার পরিণতিতে তার জীবনে ট্রাজেডি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এদিক থেকে রাজবালাকে শেকস্‌পীয়রের নায়কদের 'নারী সংস্করণ' বলা যায়। আসলে অসুস্থ দাম্পত্য সম্পর্কের বিষময় পরিণতিই লেখক তুলে ধরেছেন নায়কের বিপরীতে দুই নারীকে সামনে রেখে। লেখকের 'চন্দ্রসূর্য যতদিন' গল্পেও দেখি স্বামীত্বের অধিকারের প্রশ্নে ক্ষণপ্রভাব স্বামী যখন তার শ্যালিকাকে বিয়ে করে আনে, তখন থেকে ক্ষরপ্রভার সঙ্গে স্বামীর দূরত্ব তৈরী হয়। সন্তান নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে উন্মাদ হয়ে যেতে দেখা যায় গল্পের শেষে—''হঠাৎ মেঘের ডাকে ঘুম ভাঙিয়া দীনতারণ দেখিল ক্ষণপ্রভা শয্যায় নাই, ছেলেটিও নাই, দরজা খোলা।... ঘরে নাই, বারান্দায় নাই, বাড়ির ত্রিসীমানায় নাই। কিন্তু কোথাও সে ছিল— ভোরবেলা

একজন তাহাকে ধারিয়া আনিয়া হাজির করিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া দাড়াইল, সবাই মুখ ফিরাইল। এখন সে নগ্ন দেহ—

সম্পূর্ণ উন্মাদ; কিন্তু ছেলেটি বুকে আছেই।"[৩৪]

নারী-পুরুষের সম্পর্কের সমীকরণের এই জটিলতা আরও জটিল হয়ে উঠেছে লেখকের 'নিষেধের পটভূমিকায়' উপন্যাসে। প্রথমে এটি 'শঙ্কিতা অভয়া' নামে গল্পাকারে বেরিয়েছিল। কাহিনীটিতে অভয়া তার কন্যা শান্তিকে নিয়ে একদিন অতুলের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিল। যুবতী শান্তির সঙ্গে তার সৎ পিতা অতুল নারী-পুরুষের সম্পর্কের সবদিক নিয়েও খোলামেলা আলোচনা করে। এমনকি শান্তিকে নিয়ে সিনেমায় পর্যন্ত যায়। এসব দেখে শুনে অভয়া ভীষণ শঙ্কিতা। রাত দশটা বেজে গেলেও তারা গৃহে ফিরছিল না দেখে অভয়া গভীর দুশ্চিন্তাবোধ করে। তারা ফিরে এলে শঙ্কিতা অভয়া শান্তির কাছে প্রশ্ন করে—''বল সত্যি করে শান্তি, ও তোকে নষ্ট করেনি তো?"[৩৫]

যে পুরুষের হাত ধরে স্বামীর সংসার ত্যাগ করেছিল অভয়া তার প্রতি বিশ্বাস রাকতে পারেনি। দাম্পত্যে পারস্পরিক বিশ্বাসটাই বড় কথা। এই বিশ্বাস না থাকলে সেই সম্পর্ক একটা অসুস্থ রোগগ্রস্ত সম্পর্কমাত্র। এবং তার ফল কখনোই ভালো হয় না। অভয়ার প্রশ্নে শান্তি শুধু বিস্মিত হয়েছে তাই নয়, সে তার প্রকৃত পরিচয় জানতে চেয়েছে। জানতে চেয়েছে কেন অভয়া তাকে তার বাবার কাছ থেকে নিয়ে চলে এসেছে। কেন বাবার কাছে তাকে রেখে আসেনি। এরপর শান্তি ফিরে গেছে তার প্রকৃত পিতার কাছে। কিন্তু যেখানে গিয়েও সে হতাশ হয়েছে। তার জন্মদাতাও আবার সংসার পেতেছে। ফলে সেখানে সৎমা ও সমাজের ভয়ে তার পিতা বসন্ত তাকে আশ্রয় দেয়নি। এইভাবে অসুস্থ দাম্পত্যের কবলে পড়ে একটি শিশুর ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হয়ে গেছে। যদিও লেখক এরপর শান্তির উত্তরণ দেখিয়েছেন, কিন্তু সেটা যথেষ্ট বাস্তবোচিত হয়নি।

বিচিত্র রকম মানুষের সংস্পর্শে আসার সূত্রে লেখক সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের অসুস্থ দিকটি বারবার তুলে এনেছেন। বেশীরভাগ পুরুষ ভাবে স্ত্রী হল স্থায়ী মূলধন। সে তো ঘরে থাকবেই। যদি অতিরিক্ত কিছু স্বাদ বাইরে থেকে পাওয়া যায় তবে মন্দ হয় না। এরকম কদর্য মানসিকতার পুরুষ 'গতিহারা জাহ্নবী' উপন্যাসের অকিঞ্চন। বিবাহিতা স্ত্রীকে সে কোনোকালেই সম্মান দেয়নি। পাড়ার সমবয়সীদের সঙ্গে সে বেড়ে ওঠে; কিন্তু বন্ধুদের

থেকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয় তার জীবন। যথাসময়ে সে বিয়ে করে কিশোরীকে। 'অপদার্থ অকিঞ্চনের' স্ত্রীর পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—''প্রবোধের স্ত্রী শীর্ণা, সুধীরের স্ত্রী স্থূলাঙ্গী, গণেশের স্ত্রী কৃষ্ণকায়া, এ্যম্বকের স্ত্রী স্থূলমধ্যা, অরুণের স্ত্রীর চক্ষু ক্ষুদ্র ইত্যাদি। অকিঞ্চনের স্ত্রীর নিখুঁত দেহ। চন্দ্রের মতো অশেষ তাহার দেহের লাবণ্য, অঙ্গের প্রভা, মুখের স্ত্রী, গঠন-সুষমা তাহার অতুলনীয়। অত্যন্ত সচেতন মনে সেই রূপ বেশীক্ষণ দেখা যায় না।''[৩৬]

কিন্তু কিশোরীর এই রূপ লাবণ্য ও সংবেদনশীল হৃদয়বৃত্তি অকিঞ্চনের মনকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। সে স্ত্রীকে ছেড়ে বন্ধু মহলেই পড়ে থাকে। এবং স্ত্রী সম্পর্কে বন্ধুদের প্রশংসায় খুবই নিস্পৃহ থাকে। স্থূল দেহসর্বস্ব বন্ধুদের চেয়েও অধম অকিঞ্চন। স্ত্রীর সম্পর্কে তার ভাবনা অত্যন্ত কদর্য। এই অপ্রীতিকর দৃশ্যের বর্ণনা করে লেখক জানিয়েছেন—''অকিঞ্চনের তরফ হইতে স্ত্রীর সম্বন্ধে একটা প্রবল উল্লাস আর উচ্ছ্বাস দেখিবার আশা করিয়া তারা কথাটা তোলে—প্রশ্নের মধ্যে তাদের নিজেদেরই একটা সূক্ষ্মতম অভাবের অনুভূতি যেন তৃপ্তি খুঁজিয়া বেড়ায়; কিন্তু অকিঞ্চনের সম্বিত নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের মত, থাকিয়াও নাই, পৃথিবীর জীবনের জীবন যেরূপ সেই রূপের নাগাল পাইয়াও সে যেন উন্মীলিত চক্ষুর দৃষ্টির দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চায় না।''[৩৭]

অকিঞ্চনের ভেতরে একটা চরম অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। কিশোরী তো তার স্থায়ী সম্পদ, কিন্তু সেই মেয়েটি একদিনের জন্যেও তার হল না ভেবে সে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তার মরে যেতে ইচ্ছে করে। বন্ধুদের কাছে রসিয়ে বসিয়ে সেই গল্প করে। ফলে তার এই আদিমতার কথা সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামের বিধবা বৃদ্ধা কিশোরীর শাশুড়ির কাছে ধাবিত তেল শোধ দেবার নাম করে অকিঞ্চনের সেই আদিম লোলুপতার কথা তোলে। সমস্ত রটনার কথা অকিঞ্চনের কানে গেলেও সে নির্বিকার। স্ত্রীর কাছে সেই 'সই'য়ের কথা তোলে যাকে বিয়ের সময় দেখেছিল। এমনকি প্রচণ্ড আশংকা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাপের বাড়ী গেলে সেখানেও অকিঞ্চন অনায়াসেই স্ত্রীর কাছে তার সখি অপরার কথা তোলে—'তোমার সইকে দেখলাম না 'তো'? বজ্রাহত কিশোরী স্বামীকে চলে যেতে বলার জন্য মাকে সব জানায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা ও অন্যান্য শুভাকঙ্ক্ষীদের অনুরোধে কিশোরী শেষ পর্যন্ত শ্বশুর বাড়ীতে আসে। অকিঞ্চনের গল্প তখনো কিশোরীর বান্ধবীকে নিয়ে। বাগ্‌দিপাড়ায় 'খারাপ' মেয়েদের সঙ্গে

তার সম্পর্ক জানাজানি হয়ে গেছে। স্বামীর কবল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কিশোরী বাপের বাড়ী চলে গেছে, আর ফিরে আসেনি শ্বশুরবাড়ীতে। কিন্তু দৈবনির্ধারিত পথেই সে দু'মাস যেতে না যেতেই গভীর বেদনার সঙ্গে অনুভব করে সে গর্ভবতী। সংসারের আর কোনো নারী জঠরে সন্তান আগমনের সংবাদ কেউ এমন যন্ত্রণার সঙ্গে গ্রহণ করেছে কিনা তার কোনো উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন নিরর্থক অযাচিত ব্যাপার একদিকে হাস্যকর অন্যদিকে হৃদয় বিদারক হয়ে আর কোনো নারীর জীবনে কখনোই ঘটেনি। কিশোরীর মনে হয়— ''... এই সন্তান কি স্বামীর আত্মজ? স্বামী যাহা অকাতরে দান করিয়া করিয়া ইহকাল ও পরকাল ব্যাপী কলুষ মর্ম্মে আত্মায় পুঞ্জীভূত করিয়াছিল, এই সন্তান সেই অশেষ কলুষজাত, ইহা শুভ নহে, সার্থক নহে, ঈপ্সিত নহে, ইহা অবাঞ্ছিত এবং বর্জনীয় কলুষ।''[৩৮]

অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কিশোরী চরিত্রটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ' যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনী চরিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। দু'জনের তুলনা করে তিনি লিখেছেন—''স্থূল স্বামী এবং আদর্শ রুচি, পত্নীর ব্যক্তিত্ব সঞ্জাত দ্বন্দ্বের আশ্চর্য শিল্পরূপ আমরা 'যোগাযোগ' উপন্যাসেও প্রত্যক্ষ করি। 'যোগাযোগের' ব্যক্তিসত্তাগুলি নিজ নিজ ইতিহাসের যোগফলে জগদীশবাবুর ব্যক্তিবৃন্দ অপেক্ষা বিরাটতর। উপন্যাসের উদ্দিষ্ট রসবস্তুকে শিল্পের ও জীবনের ন্যায়ে বন্দী করার প্রয়াসেও রবীন্দ্রনাথ অধিকতর অভিনিবেশের পরিচয় দিয়েছেন।''[৩৯]

পুরুষের চোখে নারীর অবমাননার এই চিত্র জগদীশবাবুর 'মহিষী' উপন্যাসটিতেও আমরা লক্ষ্য করি। পুত্রের জন্য পাত্রী নির্বাচন করতে গিয়ে ব্রজকিশোর পাত্রীর পিতার বিষয় সম্পত্তিকেই প্রাধান্য দেন। সেই বিকারে তিনি বাতাসপুরের মন্মথ চৌধুরীর কন্যাকে নির্বাচন করেন। বন্ধু মারফত পাত্রী দেখার প্রস্তাব পাঠিয়ে ছেলে অশোক ব্যর্থ হয়ে পিতার পছন্দের কালো মেয়েটিকেই বিবাহে সম্মত হয়, তা না হলে পিতার বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হবে। স্ত্রীকে সে সমাদরেই গ্রহণ করে। কিন্তু যেদিন পিতার গোপন অভিসন্ধি জানতে পারে সেদিন থেকে নিরপরাধ জ্যোতির্ময়ীর প্রতি তার অন্যায় আচরণ বর্ষিত হতে থাকে। লাঞ্ছিতা অপমানিতা জ্যোতির্ময়ী পিত্রালয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এবং স্ত্রীর চোখে যাবতীয় দায় চাপিয়ে দেয় স্বার্থপর অশোক। বন্ধুদের কাছে সে অনায়াসেই স্ত্রী সম্পর্কে বলেছে—''কালো বউ আরো আছে; কালো বউ নিয়ে সুখ-শান্তিতে আছে, এমন মানুষও আছে। কিন্তু এ একেবারে। ...

প্রবৃত্তি বড় জঘন্য, আর ঘেন্না বলে কোনো আবরণ তার নেই। হস্তিনী নারীর সব লক্ষণ তাতে বিদ্যমান।"[৪০]

এই রটনাক্রমে প্রচারিত হয়ে জ্যোতির্ময়ীর পিতা মন্মথনাথের কানে যায়। পিতার কাছে এই সংবাদ পেয়ে জ্যোতির্ময়ী শ্বশুর বাড়ী ফিরলেও অশোক তাকে গ্রহণ করেনি। ফলে তাদের শয্যা পৃথক হয়েছে। ব্যর্থ যৌবনের তাড়নায় একদিন অশোক স্ত্রীকে শারীরিক ভাবে পেতে চেয়েছে। কিন্তু জ্যোতি অত্যন্ত ঘৃণা ভ'রে স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করেছে। জ্যোতি বুঝেছিল অশোক তাকে ভালোবাসে না। শুধু তার শরীরটাকে ভোগ করতে চায়। সেজন্যে অশোক একটা মীমাংসাতেও আসতে রাজি। শরীর সর্বস্ব স্বামীকে সে জানিয়েছিল—"... দিতে না এসে নিতে আসা তোমাদের পক্ষেই সম্ভব; কিন্তু সম্পর্ক তাতে জন্মে না, আমরা তা পারিনে।... শয্যাংশ দিয়ে যদি আমায় কৃতার্থ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে সে তোমার বৃথা আশা। ... তুমি যে ত্যাগ করেছিলে, সেইটেই সত্য। মাকে বলেছি ক'নে দেখতে।"[৪১]

মূলত জ্যোতিরই উদ্যোগে অশোক পুনঃরায় বিয়ে করে। এরপর শাশুড়ির কাছে পিত্রালয়ে যাবার ইচ্ছা পোষণ করেছে। স্বামীর কাছে বিদায় চাইতে গিয়ে সে দেখে অশোক নববধূর সঙ্গে রসালাপে মগ্ন। জ্যোতির্ময়ী অনুভব করে তার স্বামী ভোগ্যবস্তু পেয়ে গেছে। এইভাবে অসহনীয় দাম্পত্য জীবন থেকে জ্যোতির্ময়ী মুক্তি খুঁজেছে।

'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' উপন্যাসেও মল্লিকার অসুস্থতার কথা না ভেবে তার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা বংশধর প্রত্যাশা করলে অসুস্থ মল্লিকা একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। এবং পরে আর গর্ভধারণ করতে না চেয়ে পিত্রালয়ে চলে যায়। স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে সে আর আসতে না চাইলে মামলা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এককথায় নারীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল মা হওয়া —এমন একটি শাশ্বত ধারণা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নারীর উপর। সেই গতানুগতিকতা ভেঙ্গে মল্লিকা আপন নারীসত্তাকেই বড় করে তুলেছে। পুরুষ প্রধান সমাজে নারীর এইভাবে নিজেদের স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করার আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

"বাংলা কথাসাহিত্যে নারী চিত্তের সচেতনতা রবীন্দ্রনাথই প্রথম সূচিত করেন। নারী চরিত্রে মর্যাদার প্রতিষ্ঠায় শরৎচন্দ্রও পশ্চাৎপদ ছিলেন না— কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যা ছিল তাত্ত্বিক আদর্শবাদ ও মানবতত্ত্বের অখণ্ড প্রকাশ এবং শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ছকে ধৃত

মানস-কল্পনার প্রতিচ্ছবি, জগদীশগুপ্তের কলমে তা বাস্তবতার বিচক্ষণ দৃষ্টিতে সম্পৃক্ত হয়ে অন্য একটি মাত্রা লাভ করেছে।"[৪২]

লেখকের 'নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ' উপন্যাসে কুম্ভকর্ণ শশধর ছিল তার স্ত্রীর কাছে বীরপুরুষ। স্বামীর সম্পর্কে স্ত্রীর মনে মনে গর্ভের সীমা ছিল না। কিন্তু তার অন্তরস্থ কুম্ভকর্ণ সত্তাটি যে শেষপর্যন্ত সংকটের আবর্তে পড়েও জাগরিত হয়নি এবং তার ফলে স্ত্রীর চোখে তার বীরসত্তার পতন ঘটেছে। আবাল্য ভীরুতা নিয়ে সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বেড়ে উঠেছিল শশধর। পরে শরীরচর্চা করে অসীম বলের অধিকারী হয় সে। স্থানীয় একটি ষাঁড়ের কবল থেকে সে দিনকর দে নামক বিপন্ন পথচারীকে রক্ষা ক'রে বিখ্যাত হয়ে যায়। চারদিকে তার বীরত্বের কথা ছড়িয়ে পড়ে। তার অনেক শিষ্য জুটে যায়। তার স্ত্রী নিজেকে 'ভীমের স্ত্রী' বলে গর্ব করতে শুরু করে। এমন অবস্থায় একটি রাতের ঘটনায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের পতন ঘটে। প্রতিবেশী নকুলের বাড়ীতে ডাকাত ঢুকেছিল। গতবছর এমন দিনেই দূরের একটা খড়ের বাড়ীতে আগুন লেগেছিল সন্ধ্যার পর। শশধর ভাতের থালা ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে একাই একশোজনের কাজ করেছিল। আগুনের গ্রাস থেকে অনেক সম্পত্তি রক্ষা করেছিল, দু'খানা ঘর ভেঙে ফেলেছিল প্রায় একাই। কিন্তু ডাকাতি পড়ার দিনের ঘটনায় শশধরকে ব্যগ্র হতে দেখা গেল না। সে শুয়েই রইল। ওঠার কোনো চেষ্টা সে করলো না। লেখক জানিয়েছেন—''একটি নারী কণ্ঠের আর্তনাদ কানে আসিল—আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করিয়া, জ্যোৎস্নালোক তামস তুহিন পুঞ্জে আবৃত করিয়া, জীবনের জাগৃতিকে শিহরিত করিয়া এবং বোধহয় অন্তরের দেবতাকে বিদ্ধ করিয়া সে শব্দ উত্থিত হইল এবং মিলাইয়া গেল। ... তারপর গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ হইল; গুরুভার দ্রব্যটি বোধহয় মনুষ্য দেহ। ... এবং তারপরই একটা পুরুষ কণ্ঠ চীৎকার করিয়াই গোঙাইতে গোঙাইতে নিঃশব্দ হইয়া গেল।"[৪৩]

শশধরের স্ত্রী-স্বামীকে ছুটে যাবার কথা বললে 'দরকার নেই' বলে শশধর চোখ বন্ধ করে রাখে। তার চেতনার জাগরণ ঘটে না। পরদিন সকালে জানা গেল নকুলের বিধবা কন্যাকে অপরহণ করা হয়েছে। নকুলের পা ভেঙেছে। মানুষের বিপদে মানুষ এগিয়ে যাবে এটাই 'ঈশ্বর প্রদত্ত সহজ প্রবণতা'। কিন্তু শশধর প্রাণভয়ে সেই কাজ করতে পারেনি। সমবেত জনতার মনে প্রশ্ন জাগে, 'শশধর বাবু টের পান নি? অর্থাৎ শশধর জেগে থাকলে নিশ্চয়ই এমন ঘটনা ঘটতো না। কিন্তু স্ত্রীর কাছে শশধরের কাপুরুষত্বের কথা গোপন থাকেনি। স্ত্রী

তাকে অভিযুক্ত করে বলেছে—

■ ''...তুমি এমন কাপুরুষ তা জানতাম না। আমি তোমার লজ্জায় তোমার মুখের দিকে চাইতে পারছিনে।''[৪৪]

■ ''...সর্বনাশের জন্যে দায়ী তুমি—তুমি পাপী। তুমি যে যাও নি এ অন্যায়টা আমি কিছুতেই কোনো কৈফতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছি নে। বড় কষ্ট হচ্ছে আমার।''[৪৫]

■ ''... মানুষের অস্তিত্ব কেবল তার হাতের পায়ের গা-গতরের নড়াচড়ায় জানা যায় আর মনে থাকে ভেবেছ। অমন নড়া ভূতেরাও নড়ে—, জানোয়ারও নড়ে—সম্ভ্রমবোধ কতটা এই মানুষের অস্তিত্বের পরিচয়—তা তোমার নেই আর তোমার জন্যেই মানুষের তা নষ্ট হয়েছে। তোমার অস্তিত্বই আমি দেখছি নে।''[৪৬]

■ ''... তোমার তরুণ ভক্তেরা তোমায় কি মনে করবে এখন? তাদের সামনে মুখ তুলতে পারবে? ... এ তোমার সাময়িক ভীরুতা নয়, তোমার মজ্জাগত চিরদিনের ভীরুতা। তোমার কোনো মূল্য নেই।''[৪৭]

নিজেকে নিষ্ক্রিয় রেখে শশধর এইভাবে নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের মতো পড়ে থেকে স্ত্রীর চোখে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। একটি ঘটনার বিষময় ফল হিসেবে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বাঁধন আল্‌গা হয়ে গেছে। যেখানে পৌঁছে স্ত্রীর মনে হয়েছে, তার কাছে তার স্বামীর আর কোনো মূল্য নেই।

লেখকের 'নন্দ আর কৃষ্ণা' উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কে ত্রিমুখী দিকের পরিচয় লেখক তুলে ধরেছেন। পুরুষের রূপজ মোহ ও তার সমস্যা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। সম্পর্কের ত্রিমুখী কৌণিকতার কেন্দ্রগুলি হল—

■ মমতা ও নন্দকিশোর

■ কৃষ্ণা আর মণীন্দ্র এবং

■ নন্দ আর কৃষ্ণা।

মণীন্দ্রবাবু তার প্রথম পক্ষের ছেলের গৃহ শিক্ষক হিসেবে নন্দকে নিযুক্ত করেন। আর নন্দ যাকে মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী বলে জানে সেই কৃষ্ণা আসলে মণীন্দ্রবাবুর রক্ষিতা। কাহিনীর প্রথম ভাগে কৃষ্ণার অনাবৃত দেহ আকস্মিকভাবে দেখে ফেলে নন্দ। তীব্র অপরাধবোধের তাড়না এবং শাস্তির ভয়ে সে পলায়ন করেছে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে গৃহের পরিবেশে স্ত্রীর মমতায়

স্নিগ্ধ সাহচর্যেও কৃষ্ণার রূপ ও যৌবনের আকর্ষণ ভুলতে পারেনি। এই আকর্ষণ শুধু নন্দর দিক থেকে নয়, কৃষ্ণাও পলায়নরত নন্দর উদ্দেশ্যে জানিয়েছে—''পালাবেন না; আমাকে আয়নায় যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখা আমার ভালো লাগে, আপনাকে আরো—আপনি নির্ব্বোধ, তাই দিশে পান না, পালান্।''[৪৮] বিগত যৌবন মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে কৃষ্ণার কোনো জৈবিক মিলনের উত্তাপ উপন্যাসে নেই। কিন্তু মণীন্দ্রবাবুর মধ্যে বিকৃত কামের প্রকাশ আছে; আর তার রক্ষিতা কৃষ্ণার মধ্যে রয়েছে অতৃপ্ত কামনা। সেই কামনার আগুনেই কৃষ্ণা পুরুষদের মোহিত করে পোড়াতে ভালোবাসে। কিন্তু নন্দ কৃষ্ণার আহ্বান উপেক্ষা করেই পালিয়ে গেছে তার স্ত্রীর কাছে। যাবার সময় বিকৃতকাম মণীন্দ্রবাবু নন্দকে নির্দিষ্ট দিনের ছুটি মঞ্জুর করেছেন; কারণ তার মনে হয়েছে তেইশ বছর বয়সে বিয়ের পর কোনো পুরুষের পক্ষে একা থাকা খুব কষ্টকর আর এই কাজে বাধা দিলে তার অভিশাপ লাগবে। ছুটি মঞ্জুর নিয়ে দু'জনের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছে তাতে মণীন্দ্র'র বিকৃত রুচির প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

''...গৃহ শিক্ষকের আনন্দেই অনুকম্পাশীল অভিজ্ঞ ঐ ব্যক্তির আনন্দ কিনা তাহা নন্দ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, যাবো?

— যাও; কিন্তু—

— দু'রাত্রি পাবে?

নন্দ জবাব দিল না—

মণীন্দ্র বলিলেন, দিনে গাড়ী কখন?

— তিনটেয়।

— তা হলে দুপুরটাও পাচ্ছ। বলিয়া মণীন্দ্র সম্পর্ক বিগর্হিত এবং বয়সের তারতম্য হিসাবেও অত্যন্ত অনুচিত একটা ইঙ্গিতের হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন।''[৪৯] গৃহে পৌঁছে নন্দ স্ত্রী ও মায়ের জেরার মুখে পড়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। বলে পালিয়ে চলে এসেছে। স্ত্রীকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে আলিঙ্গন করে। কিন্তু স্ত্রীর পাশে শুয়েও নন্দর অবচেতন মন কৃষ্ণার রূপকে ঘিরে স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্নের প্রেক্ষাপট রচনায় লেখক জানিয়েছেন—

''নারীর রূপ আর আকর্ষণ, বিভ্রান্তিকর সেই মোহন ইন্দ্রজাল, পুরুষ অত সহজে আর অত সত্ত্বর ভুলিতে পারিলে পৃথিবীর বুক হাল্কা, কাব্য ক্ষুণ্ণ এমন কি মরণশীল, পুরাণ

অপাঠ্য, আর পাগলের সংখ্যা চৌদ্দ আনা হ্রাসপ্রাপ্ত হইত। তা যাতে না হয় সেই জন্যই বোধহয় নন্দকিশোর সেই রাত্রেই এক অভাবনীয় স্বপ্ন দেখিল।"[৫০] নন্দের স্বপ্নে ধরা দিয়েছে কৃষ্ণা, যার ভয়ে নন্দ বাক্স-বিছানা আর একুশ দিনের বেতন ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছে; সেই কৃষ্ণা একটি অতি উজ্জ্বল সিংহাসনে বসে আছে, পা দুটো স্থাপিত হয়েছে সাদা গজদন্ত নির্মিত একখানি পাদপীঠের ওপর, অস্তগামী সূর্যের লাল আভার মত তার বসন এবং নন্দকিশোর তারই পদপ্রান্তে বসে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে। এই স্বপ্নই নন্দকে যুবতী স্ত্রীকে ছেড়ে কৃষ্ণার কাছে টেনে এনেছে। মণীন্দ্রবাবু ব্যাঙ্কের কাজে এলাহাবাদে গেলে কৃষ্ণার প্রতি নন্দর যৌন অনুভূতি ও ভোগলালসা চরম আকার ধারণ করেছে। এর বিপরীতে কৃষ্ণার অন্তর্গত স্বরূপটিও লেখক উদ্‌ঘাটিত করেছেন। পুরুষকে এভাবে খেলাতেই তার চিত্ত সুখ হয়। তার ভেতরের বিকৃত সত্তাটি প্রকটিত হয়েছে কৃষ্ণার মায়ের কথাতেই। তিনি মণীন্দ্রর বাড়ী গিয়ে নন্দকে দেখেই ভয় পেয়েছিলেন। এই ভয়টা নন্দর দিক থেকে নয়, তার নিজের মেয়ের দিক থেকেই। নন্দর সহজ-সরল-কচি মুখটা তাকে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। নন্দকে তিনি অকপটে জানিয়েছেন—''তোমাকে বল্‌ব কি বাবা, মেয়েটা চিরকাল শয়তান।... ভারি নিষ্ঠুরের মতো স্বভাব ওর। রূপ আছে, রূপের জোরে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে মজা দেখা ওর মজ্জাগত অভ্যাস। কতজনকে যে মিছিমিছি পাগল করেছে তার ইয়ত্তা নেই। মনে হয়, কাউকে ভালোবাসে না, বাসতে পারেই না, ঈশ্বর ওকে সে ক্ষমতা দেন নাই। তোমাকে মণির বাড়ীতে দেখে আমার তৎক্ষণাৎ মনে হল, আর, ভারি ভয় হল যে, এই ভালো ছেলেটাকে বজ্জাত মেয়ে আমার কষ্ট না দিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না।"[৫১] কৃষ্ণার মায়ের এই সতর্কবাতায় নন্দ'র চোখ খুলে যায়। কৃষ্ণার মাকে সে 'ঘেন্না' করে কিনা জানতে চাইলে সে 'না' সূচক মত দিয়েছে এবং সেইসঙ্গে কৃষ্ণার মাকে বলেছে—''আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন শৃঙ্খলমুক্ত করে' নবজীবন দান করেছেন, সুখী করেছেন।"[৫২] এই মুক্তির পরে পরেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে 'মমতার মুখচ্ছবি'। এইভাবে পুরুষের রূপজমোহ থেকে নন্দের মুক্তি ঘটেছে। নদীর পাড় ভাঙ্গাগড়ার মতো সম্পর্কের টানা পোড়েনের অবসান ঘটেছে এবং নন্দ ফিরে গেছে তার সুস্থ জীবনে।

'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাসটি প্রথমে 'নিরূপম তীর্থ' বা 'ত্রিলোকপতির তীর্থ ভ্রমণ', 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' বা 'আহুতি' শীর্ষক বিভিন্ন ছোটগল্পাকারে বেরিয়েছিল। উপন্যাসটি আত্মপ্রকাশ

করে লেখকের মৃত্যুর পর। 'কলঙ্কিত তীর্থ' গল্পটিতে নারী ঘটিত অপরাধের ফলে সাতকড়ি জেলে যায়। দীর্ঘ দেড় বছর পর জেল থেকে ফিরে এলে বাড়ীর সকলেই তাকে গ্রহণ করে কিন্তু স্ত্রী মাখন তাকে মেনে নিতে পারে না। এই মেনে নিতে না পাবার জন্যে শাশুড়ি সমাজপতির ভূমিকা নিয়ে মাখনকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। এরপর উপন্যাসে মাখনকে উদ্ধার করে ত্রিলোকপতি এবং পরে বিগ্রহের সামনে পরপর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সাতকড়ি মাখনের সম্পর্কের দিকটি যতটা বিশ্বস্ত হয়েছে কিন্তু মাখন-ত্রিলোকপতির অধ্যায়টি ততখানি বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী এলে সাতকড়ি বা সাতুর জীবনে সে হয়ে ওঠে সবচেয়ে কাছের মানুষ—এটাই প্রচলিত রীতি। শাশুড়িও তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন ছেলের বন্ধন সেই, জীবনের শৃঙ্খলা সে-ই, সৌষ্ঠব, স্ত্রী, সুখ, সৌন্দর্য-সবকিছু তারই হাতে। কিন্তু মধুডাঙার হাটে রাতের অন্ধকারে ইয়ার-বন্ধুসহ বাইশ তেইশ বছরের বিধবা মেয়েটির সঙ্গে 'ফুর্তি' করতে গিয়ে সাতকড়ি ধরা পড়ে। মাখনের পৃথিবী ওলোট-পালট হয়ে যায়। পুত্রকে মাখনের হাতে তুলে দিয়ে শাশুড়ি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। মাখনের অস্তিত্বই যেন হয়ে উঠেছিল অপরাজেয় অপরিহার্য শাসন বাণী; তাকে লঙ্ঘন করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু সাতকড়ি জেলে গেলে মাখনের মনে হয় সেই শাসনদণ্ড আজ শিথিল হয়ে ধুলোয় লুঠাচ্ছে। নিজেকে তার অতিতুচ্ছ ও অকর্মণ্য গুরুত্বহীন মনে হতে থাকে। তার এই মানসিক অসহায়তা ব্যক্ত করে লেখক জানিয়েছেন—"... দুনিয়ার লোকে কি বলিতেছে কি ভাবিতেছে সে জানে না; কিন্তু স্বামীর জীবন হইতে নিজেকে বিচ্যুত করিয়া লইয়া সেত' সরিয়া স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না ... তাহার পৃথিবী অতিশয় ক্ষুদ্র ... স্বামীর সত্তার বাহিরে যে জীবন্ত পৃথিবী রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে সংযোগ তার স্বামীকেই বৃন্ত করিয়া, স্বামীকেই বৃন্ত রূপে পাইয়া সে চারিদিকের হাওয়ার মাঝে ফুটিয়া আছে ... তাহার পরিচয়ই ঐ।"[৫৩]

একান্ত স্বামী নির্ভর জীবনে মাখনের পৃথিবী বিকৃত একাকার হয়ে ছন্নছাড়া মৃতের শ্মশান হয়ে গেল। যে পথে মাখন আলো দেখত, যে পথে সে গান শুনত, যে পথে সুধা ঝরত, চোখের নিমেষে সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে জগতের সঙ্গে তার আর সম্পর্ক রইল না। মাখনের এই নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব বাড়ীর কেউই অনুভব করেনি। সাতকড়ি তো নয়ই। স্বামীর কথা ভাবতে গিয়ে চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলে মাখন। যার সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন সেই স্বামীর অপরাধ গুরুতর। এতটাই গুরুতর যে সেই চিন্তা মাখনের সহ্য হয় না। মানুষ কোনদিন তা সহ্য করতে

পারেনি। সন্তানের জননী হয়ে, কূলের বধূ হয়ে, নারী তাকে ক্ষমা করেনি। ভগবানের নাম বুকে আছে, পশু হয়ে জন্মগ্রহণ করিনি এমন জ্ঞান যার আছে, সে তা ক্ষমা করেনি। তবু বাস্তবে দেখা যায় সাতকড়ি ঘরে ফিরে যেন বাড়ীর সকলের দ্বারা যুদ্ধজয়ী বীরের সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছে। কিন্তু মাখন এমন স্বামীর ছায়াটুকু দেখার কথা ভাবতেই মূর্ছিতা হয়ে পড়েছে। তার সেই অন্তরস্থঃ অসহায়তা ব্যক্ত হয়েছে লেখকের অকৃত্রিম শিল্পী চেতনার অক্ষরে—

''মাখনের ভয় করিতে লাগিল—

কালের অতল গর্ভে অবতরণ করিয়া কাহারা যেন মন্থনে রত হইয়াছে—তাদের হারানো রত্ন খুঁজিতেছে। তাদের হাতের শব্দ নাই, পায়ের শব্দ নাই, মুখে শব্দ নাই। তাদের নির্মমদণ্ড প্রহারে আবর্ত কেন্দ্র হইতে ঢেউ ছুটিতেছে ... আগে ধোঁয়া, তারপর ফেনমুখী হলাহল উদগারিত হইতেছে। সেই হলাহলের পাত্র হাতে লইয়া কে যেন অগ্রসর হইতে লাগিল।''[৫৪]

স্বামীর অপরাধ ক্ষমা করতে না পারার অপরাধে মাখনকে সংসার থেকে বিতাড়িত হতে হয়। পরে তার দ্বিতীয় জন্মলাভ হয় ত্রিলোকপতির হাতে। কিন্তু সেই অংশের সম্পর্ক সূত্র রচনায় কেমন যেন একটা আদর্শের গন্ধই থেকে গেছে শেষ পর্যন্ত। কারণ এই অংশে ত্রিলোকপতির ভাবনায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক একটা পবিত্র তীর্থক্ষেত্রেই আটকে থেকেছে। রক্ত মাংসের বাস্তব জীবনের মাটিতে অবতরণ করেনি। এই ত্রিলোকপতির সঙ্গে 'চৌধুরাণী' উপন্যাসের সূর্যসেনের সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। সূর্যসেনের মতোই ত্রিলোকপতিও ভেবেছে—''পশু পক্ষিগণের কি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় কে জানে। তাহাদের পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না; কেহ মন্ত্রপাঠ করায় না; কেবল মানুষই নিজেকে এ বিষয়ে নিতান্ত পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে তার মানে আছে। মানুষকে আবদ্ধ করা হইয়াছে সত্য, অনেক দিক নিষিদ্ধ করাও হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে সাধুজনের পরম ইপ্সিত একটা ক্ষেত্রে অশেষ অব্যাহতিও দেওয়া হইয়াছে—সেই ক্ষেত্রটি সনাতন, নিষ্কলুষ—অধ্যাত্ম জাগরণ দ্বারা গ্লানিনির্মুক্ত সেই ক্ষেত্রে দেহের মিলন হয়, এবং মিলন সার্থক হয়। ইহাই সেই অধীনতার মমার্থ, পশুর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ঐখানে; কেবল সন্তান-সৃষ্টিই তার উদ্দেশ্য নয়, হইতে পারে না।''[৫৫]

এইভাবে লেখক নারী পুরুষের সম্পর্ককে একটা আদর্শলোকে পৌঁছে দিয়েছেন ত্রিলোকপতি

আর সূর্যসেনের চোখ দিয়ে। 'চৌধুরাণী' উপন্যাসে সূর্যসেনের ডায়রিতে এরকম নানা ব্যাখা আমরা দেখি নারী পুরুষের সম্পর্ক বিবাহ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। কয়েকটি ভাবনা সরাসরি 'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে—

■ ''পুরুষ আসিয়া মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইবে। ... মন্ত্রশক্তির দ্বারা জীবনে একটা অকাট্য গ্রন্থি দিবার অভিনয় করিয়া পুরুষটি মেয়েটিকে লইয়া যাইবে সন্তানার্থে এবং সুলভে এমন সব স্থূল কাজ করাইয়া লইবে যার নাম হইবে স্বামিসেবা এবং গৃহস্থালী।''[৫৬]

■ ''... বিবাহ আর কিছুই না, উভয় পক্ষেরই অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষের, জীবনযাপন-বিষয়ক একটা সুবিধাবিধায়ক চুক্তি মাত্র। পুরুষের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়া স্ত্রী থাকিবেন পোষ্য এবং উপযুক্ত ব্যবহার আর অন্নবস্ত্র না পাইলে স্ত্রী করিবেন গোঁসা। গোঁসা করিবার অনুমতি স্ত্রীকে দেওয়া আছে। আবার কি চাই?''[৫৭]

■ ''বিবাহে দেনা-পাওনা লইয়া মন গরম আর কষাকষি আমি মোটেই পছন্দ করিনা — মনে হয়, বিবাহের সম্ভ্রমহানি ঘটিতেছে, তার মাধুর্যের চমকারিত্ব নষ্ট হইল। যদি এমন হয়, একটি ছেলে আর একটি মেয়ের ভাব হইল; বিবাহে তারা সম্মত হইল; তখন তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া গেল কোনো দেব মন্দিরে; পুরোহিত তাহাদের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেবতার আশীর্বাদ যাঞ্চা করিলেন; একাত্মকারী মন্ত্র পাঠ পূর্বক তাহাদের মস্তকে নির্মাল্য স্পর্শ করাইলেন—শ্বেত চন্দনে তাহাদের ললাট চর্চ্চিত করিয়া দিলেন; দেবতাকে জাগ্রত জানিয়া তাঁহারই গোচরে তাহারা বিবাহিত হইল।

যদি এমন হয়, তবে মন্দ হয় না—অনেক দাহ জন্মেই না।''[৫৮]

■ ''স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলা হয়—মিথ্যা বলা হয় না; স্বামী পতি, ইহাও মিথ্যা নয়। বিবাহকে দৈহিক সুখের আর স্বপ্ন সুখের দ্বারোঘাটনের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করার মনোবৃত্তিই বেশীরভাগ লোকের ইহাও সত্য; কিন্তু তা একেবারেই ভুল-মানুষ ভারি ভুল করে—মানুষ শোচনীয়ভাবে ঐখানটায় ভুল করিয়া বসিয়া আছে। বিবাহ ঐহিকও নয়, দৈহিকও নয়। বিবাহ পারত্রিক এবং আত্মিক।''[৫৯]

■ ''ভাবিতে সুন্দর লাগে, যে স্থানে ইহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে, সে স্থান হইবে তীর্থতুল্য... সে স্থানটি ইহাদের হৃদয়ের রামমন্দির—এই স্থানের অনন্ত রূপান্তর কেবল তাহাদিগকেই কেন্দ্র করিয়া আসিবে যাইবে, নিয়ত আবর্তিত হইবে। ঐ স্থানটা চোখে পড়িবে

না, কিন্তু মনে জাগিবে, নির্নিমেষ অপলক হইয়া জাগিবে; মানুষের শ্রদ্ধার প্রাণপাতের স্পর্শে তাহাদের প্রেমের ঐতিহ্যের সৃষ্টি হইয়া সে স্থান হইবে অক্ষয় আর চিরবরণীয়; ধ্যানে মাত্র উপলব্ধি করার মতো একটা অশরীরী মন্দির সেখানে গড়িয়া উঠিবে জগদতীত মূল্য তার মানুষ বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না; কেবল স্মরণ করিয়া অপার্থিব রসসিঞ্চনে ধন্য হইয়া যাইবে; উচ্চারণ করিবে এখানে ভালবাসা জন্মিয়াছিল স্থিতিলাভ করিয়াছিল, কিন্তু বিলুপ্ত হয় নাই—সুন্দরের মর্মে, আর প্রকৃতির বক্ষ কূহরে তাহা সঞ্চিত হইয়া আছে ...
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ইহাই।"[৬০]

এইভাবে নারী পুরুষের সম্পর্কের কলঙ্কিত তীর্থের উত্তরণ ঘটেছে ত্রিলোকপতি তথা সূর্যসেনের মনোভাব ব্যক্ত করার মধ্যদিয়ে। এই মনোভাব আসলে লেখকেরই ব্যক্তিগত চিন্তার প্রতিফলন মাত্র। ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা লেখককে এমন একটা অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছিল যে মধ্যবয়সে পৌঁছে তিনি হঠাৎই নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্লেদ-পঙ্কিলতা থেকে উর্ধ্বে উঠে সাময়িকভাবে এমন একটা স্নিগ্ধ পবিত্র ভাবনায় ক্ষণিকের জন্যে উপনীত হয়েছিলেন এমনটা কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। বরং এর উল্টোটাই তিনি আজীবন ভেবেছিলেন। একথার সমর্থন রয়েছে ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতেও— ''মধ্য বয়সে উপনীত হয়ে বাস্তব দৃষ্টি পরিত্যাগ করে তিনি আদর্শবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন এ চিন্তাও অযৌক্তিক, কারণ এরপরেও তিনি কথাসাহিত্যে বাস্তবদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, কবিতায় মোহমুক্ত বাস্তবচিত্র উপস্থিত করেছেন। আসলে, এই দুটি উপন্যাসেই জগদীশ গুপ্তের মূল সমস্যা বিবাহ সম্পর্কিত। বর্তমান ব্যবস্থায় বিবাহ নারী-পুরুষের কেবল দৈহিক মিলনের পথ পরিস্কার করে মাত্র কিন্তু বিবাহের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবণ করে অনুষ্ঠান কন্টকিত বিবাহ ব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি যে বিশুদ্ধ সমপর্ণের কথা চিন্তা করেছেন তাকে দস্তয়ভস্কি কথিত 'Higher reality' হিসাবে মেনে নিতে কোন বাধা নেই।"[৬১]

তথ্যসূত্র :

১. 'নারী' : হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০১, পৃ. ৪৩।

২. বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৭২।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

৪. রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৪১৮।

৫. রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৩৮০।

৬. রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৭৩।

৭. সুলভ শরৎ সমগ্র, ২য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৯২৯।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩৩।

৯. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, প্রা.লি., কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ২৫৫।

১০. নারী, সাম্যবাদী, সঞ্চিতা, ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পঞ্চাশৎ সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃ. ৭৮।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

১২. জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৪, কলকাতা, পৃ. ২১।

১৩. পুতুলনাচের ইতিকথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশভবন, কলকাতা, ৩৪তম মুদ্রণ, পৃ. ৯৪।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

১৫. প্রাগুকত, পৃ. ৯৪।

১৬. ফ্রয়েডের নারী চরিত্র, শ্রী নৃপেনকুমার বসু, বীণা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৪৩।

১৭. সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৭৫।

১৮. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ. ১১।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৩১. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, ২০০৮, পৃ. ২৮৪।

৩২. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ. ২০৭।

৩৩. বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৫।

৩৪. জগদীশ গুপ্তর গল্প, সুবীর রায় চৌধুরী (সম্পাদিত), দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ. ১০৪।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৩৯. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ২৩৩।

৪০. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ১৮০।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

৪২. বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশ গুপ্ত, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১৩২।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

৫৩. কলঙ্কিত সম্পর্ক, বিশু মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), পৃ. ৩।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৫৬. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., ২০০৩, পৃ. ২৮৮।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।

৬১. বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশ গুপ্ত, বিশ্ববাণী, পৃ. ১৪০।